পাইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২৫০ বা ৩৫০ বৎসর। কাহারও মতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক শিষ্যের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। (হাশিয়া বোখারী- ৫৬২)

হযরতের পবিত্র নসব বা বংশ

পরিচয় (পৃঃ ৫৪৩)

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (১) পিতা আবদুল্লাহ, (২) পিতা আবদুল মোত্তালেব (৩) পিতা হাশেম, (৪) পিতা আব্‌দে মনাফ, (৫) পিতা কুসাই, (৬) পিতা কেলাব, (৭) পিতা মোর্‌রাহ, (৮) পিতা কা'ব (৯) পিতা লুআই, (১০) পিতা গালেব, (১১) পিতা ফেহ্‌র, (১২) পিতা মালেক, (১৩) পিতা নজর, (১৪) পিতা কেনানা, (১৫) পিতা খোযায়মা (১৬) পিতা মোদ্‌রেকাহ্‌, (১৭) পিতা ইল্‌য়াস (১৮) পিতা মোজার, (১৯) পিতা নেযার, (২০) পিতা মাআদ্দ, (২১) পিতা আ'দ্‌নান।

বোখারী (রঃ) এই ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিয়াছেন। এই ২১টি পোশ্‌ত এবং তাহাদের নামগুলি সম্পর্কে মতভেদ নাই। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) স্বীয় বংশ বর্ণনায় উক্ত ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিতেন। (ফতহুল বারী ৭-১৩২)

উল্লিখিত "ফেহ্‌র" নামীয় ব্যক্তির উপনাম ছিল "কোরায়শ" এবং তিনি কোরায়েশ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হইতেই তাঁহার বংশধরগণ কোরায়েশ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অভিধান মতে "কোরায়শ" এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নাম; সেই প্রাণীটি অতিশয় শক্তিশালী, সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর রাজা। ঐ শ্রেণীর প্রশংসনীয় গুণের সূত্রেই ফেহ্‌রের এই উপনাম অবলম্বিত হইয়াছিল।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ তালিকার তিনটি অংশ-

(১) মাথার অংশ মুহাম্মদ (সঃ) হইতে "আদ্‌নান" পর্যন্ত। (২০) গোড়ার অংশ ইসমাঈল (আঃ) হইতে আদম (আঃ) পর্যন্ত। (৩) মধ্যভাগের অংশ "আদ্‌নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত। প্রথম অংশটি একুশ পোশ্‌তের- সর্বসম্মত ও অকাট্যরূপে কোন প্রকার বিভিন্নতা ব্যতিরেকে প্রমাণিত রহিয়াছে, যাহা ইমাম বোখারীর (রঃ) বর্ণনায় উপরে উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটি একুশ পোশ্‌তের; তাহাও প্রায় সর্বসম্মত, অবশ্য আদিকালের নামগুলি ভাষান্তরে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করিয়াছে। হিব্রু ভাষা হইতে যখন আরবীতে আসিয়াছে তখন নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে। যেমন, বাংলার 'দ' অক্ষর সম্বলিত নাম ইংরাজীতে লেখা হইলে তাহা 'ড' হইয়া যাইবে। আরবী হইতে বাংলায় আসিলেও নিশ্চয় বিভিন্নতা সৃষ্টি হইবে। কারণ, আরবী ভাষার জের, জবর, পেশ দ্বারা শব্দের আকৃতি গঠিত হয়, বাংলাভাষায় তাহা া, ি, ু দ্বারা হইয়া থাকে; কিন্তু আরবী জের, জবর, পেশ ছাড়াই সাধারণত লেখা হইয়া থাকে। পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাংলা শব্দ া, ি, ু ছাড়া লেখা যায় না, এতদ্ভিন্ন আরবীতে "জবর" স্থান বিশেষে "অ" এবং স্থান বিশেষে "আ" এবং "জের" "ি" ও "ে" লেখা হয়- ইত্যাদি। এইসব কারণে আদিকালের ঐ নামগুলির আবৃত্তি এবং ভাষান্তরে নানা আকারে বিভিন্নতা আসিয়াছে। নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল-

(১) ইসমাঈল (আঃ), (২) ইব্রাহীম (আঃ) (৩) তারেখ- অনেকে "তারেহ্‌" লিখিয়াছেন এবং অনেকের মতে তাঁহারই আর এক নাম "আযর" (৪) নাহ্‌র (৫) সরুগ- এই নামের উচ্চারণে বিভিন্ন মত রহিয়াছে; সারূ, শারূগ, আশরাগ, শারুখ, সরূহ (৬) রাউ (৭) ফালখ- কাহারও মতে ফালজ বা ফালগ। (৮) আইবার- কাহারও মতে আবর বা গাবর (৯) শালাখ- কাহারও মতে শালাহ (১০) আরফাখশাজ- কাহারও মতে আরফাখশাদ (১১) সাম- পুত্র নূহ (আঃ) (১২) নূহ (আঃ) (১৩) লমক- কাহারও মতে লামক (১৪) মাত্তুশালাখ (১৫) আখ্‌নুখ- তিনিই নবী ইদ্রিস (আঃ) (১৬) ইয়ার্দ (১৭) মাহলায়েল (১৮) কাইনাল- কাহারও মতে কায়েন। (১৯) ইয়ানেশ- কাহারও মতে আনূশ (২০) শীছ (আঃ) (২১) আদম (আঃ)।

মধ্য অংশ তথা ইসমাঈল (আঃ) ও "আদ্‌নান"-এর মধ্যবর্তী অংশে বিরাট মতভেদ এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় বিভিন্ন অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। নামের বিভিন্নতা ত আছেই, সংখ্যার মতভেদও আশ্চর্যজনক। অনেকের মতে এই অংশের সংখ্যা মাত্র ৭ বা ৮ জনের; আর কাহারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সীরত রচনায় ইতিহাস মন্থনকারী বিশিষ্ট লেখক মরহুম শিবলী নোমানী তাঁহার "সীরতুন নবী" গ্রন্থে সর্বোচ্চ ৪০ সংখ্যার খোঁজ দিয়াছেন। আমরাও বিশেষ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখে তাবারী" এর মধ্যে ৪০ সংখ্যার মতের উদ্ধৃতি দেখিয়াছি। ৪০ সংখ্যার অধিক সম্পর্কে কোন মতামত আছে বলিয়াও আমরা খোঁজ পাই নাই। বাংলাভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী রচয়িতাগণের একজন লেখক এই অংশে ৪০ সংখ্যাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তিনি ৪৭ সংখ্যক নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেই বরাত দিয়াছেন তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই, তবে এই উদ্ধৃতির কোন স্থানে নিশ্চয় গরমিল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

এত দীর্ঘ মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সীরাত লেখক বংশ তালিকার বর্ণনায় "আদ্‌নান" পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছেন; সতর্কতায় ইহাই উত্তম।

নবীজীর জীবনী রচনায় বিশেষ গ্রন্থ "সীরাতে ইবনে হেশাম"- ইহার মূল গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে আট সংখ্যক নামই উল্লেখ হইয়াছে। "সীরাতুন নবী" লেখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট এই সংখ্যাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাসবিদের সিদ্ধান্তে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় আগমন হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত সর্বমোট সময়কাল ছয় হাজার বৎসরের ঊর্ধে। এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সময়ের মাঝামাঝিকালে বর্তমান ছিলেন। কারণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত তিন হাজার বৎসরের সামান্য উপরে, আর আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় অবতরণ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৩ হাজার বৎসরের উপরে।

দ্বিতীয় তিন হাজার বৎসরের তথা আদম (আঃ) হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ-সূত্রের মাধ্যম হইলেন বিশ জন।

প্রথম তিন হাজার বৎসরে "আদ্‌নান" পর্যন্ত ত মধ্যের সংখ্যা ২১ জন আছেনই; তদুপরি আদ্‌নান হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত ৪০ বা ৪৭ জন হইলে এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১ বা ৬৮; এই সংখ্যার অসামঞ্জস্য ২০ সংখ্যার সহিত অনেক বেশী। পক্ষান্তরে "আদ্‌নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মাধ্যম সংখ্যা আট হইলে প্রথম তিন হাজার বৎসরে সর্বমোট মাধ্যম সংখ্যা ২৯, যাহা ২০ সংখ্যার নিকটবর্তী। দুনিয়ার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে মানুষের বয়সের যে বেশকম আছে সে অনুপাতে এইরূপ নিকটবর্তী ব্যবধানই যথেষ্ট মনে হয়; ৬১+৬৮ = এর সংখ্যার সহিত ২০ সংখ্যার যে অধিক ব্যবধান তাহা অসঙ্গত মনে হয়।

হযরতের রক্তধারায় আব্‌দিয়ত

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি; সৃষ্টির সর্বোপরি মহত্ত্ব হইল সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে আত্মনিবেদন- নিজেকে উৎসর্গীকরণ। মানুষ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি; তাহাকে সৃষ্টিকর্তা পরীক্ষার পাত্র বানাইয়াছেন, তাই তাহাকে স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতার অংশও দিয়াছেন; দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বা স্বেচ্ছাচারী- উভয় পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। মানুষ জ্ঞান-বিবেক খাটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা পরিহারপূর্বক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আবদ্ধ জীবন যাপন করুক; মানুষের প্রতি আল্লাহর আদেশ ও দাবী ইহাই। পবিত্র কোরআনে আছে-

"মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একমাত্র আমার দাসত্বের জন্য- তাহাদের হইতে আমার একমাত্র দাবী ইহাই।" এই দাসত্বের চরম পর্যায়কে "আব্‌দিয়ত" বলা হয়! অতএব, আব্‌দিয়তের অর্থ হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আত্মনিবেদন ও নিজকে চরম উৎসর্গীকরণ। সুতরাং এই আব্‌দিয়তই হইল মানুষের

মূল উন্নতির সোপান। আব্‌দিয়তহীন মানুষের জীবন ব্যর্থ; সে সৃষ্টিকর্তার দাবী আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে এই আব্‌দিয়তের পরিণামেই আল্লাহ তাআলার নিকট মানুষের মর্তবা এবং নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে এই আব্‌দিয়তের চরম পর্যায় বিদ্যমান ছিল। হযরতের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই আব্‌দিয়ত; হযরত (সঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আব্‌দিয়তকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতিটি কার্যে আব্‌দিয়ত তথা সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে নিবেদিতপ্রাণ থাকিতে ভালবাসিতেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! আমি ইচ্ছা করিলে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার জন্য লাভ করিতে পরিতাম। আমার নিকট এক (বিরাটকায়) ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, যাঁহার কোমর কা'বা শরীফের গৃহের ছাদ সমান। তিনি আসিয়া বলিলেন, আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগার আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং আপনাকে এই স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে আপনি পূর্ণ আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে রাজ্যাধিপতি নবীও হইতে পারেন। ঐ সময় জিব্রাঈল (আঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (সৃষ্টিগতভাবেই এই পরিমাণ আব্‌দিয়তধারী ছিলেন যে, উক্ত বিষয়ের নির্বাচনও নিজ ইচ্ছায় করিলেন না– তাহার জন্যও তিনি প্রভুর স্থায়ী দূত) জিব্রাঈলের প্রতি পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) ইশারায় পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বিনয়– আত্মবিলীনতা অবলম্বন করুন। সেমতে হযরত নবীজী (সঃ) ঐ ফেরেশতার কথার উত্তরে বলিলেন, আমি আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবীই থাকিব।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দেওয়া বা নিতম্বে ভর করা অবস্থায় বসিয়া খানা খাইতেন না। শুধু পদদ্বয়ের ভরে বসিয়া খানা খাইতেন এবং) বলিতেন, আমি ঐরূপেই খাইতে বসিব যেরূপে গোলাম খাইতে বসে। সাধারণ বসায়ও ঐরূপ (বিনয়ী আকারে) বসিব যেরূপ গোলাম বসিয়া থাকে। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আব্‌দিয়তের এই চরম উৎকর্ষ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত ছিলই; তাহার আরও অধিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে হযরতের পূর্বপুরুষদের বিশেষ রক্তধারা। আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হওয়ার যে চরম ও পরমতর পর্যায় আছে– আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানী করা– তাহা বিশ্ব ইতিহাসে দুই জন লোকের জীবনীতেই দেখা যায়। সেই উভয় জন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত (সঃ) নিজেই বয়ান করিয়াছেন, انا ابن الذبيحين "আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানীকারী ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র আমি।"

উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন হযরতের ঊর্ধ্বতন পিতা ইসমাঈল (আঃ)*। তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ; পবিত্র কোরআনেও সেই ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে (চতুর্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বয়ান দ্রষ্টব্য) অপরজন হইলেন হযরতের পিতা আবদুল্লাহ।

---

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশ মতে যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন সেই পুত্র ইসমাঈল (আঃ) বটে; ইসহাক (আঃ) নহেন। এই বিষয়ের একটি সহজ প্রমাণ এই যে; ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী যখন একদল ফেরেশতা মারফত আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পৌছাইয়াছিলেন তখন ইহাও বলা হইয়াছিল যে; "ইসহাক হইতে সুদীর্ঘ বংশ চলিবে।" তওরাতেও আছে– "খোদা ইব্রাহীমকে বলিলেন; তোমার বিবি ছারা একটি ছেলে জন্ম দিবে; তুমি তাহার নাম ইসহাক রাখিবে; আমি তাহার হইতে সুদীর্ঘ বংশ চালাইব।" (সীরাতুন নবী ১, ১০২) পবিত্র কোরআনেও এই শ্রেণীর বর্ণনা রহিয়াছে। যথা– "ফেরেশতাগণ ইব্রাহীম (আঃ)-কে সুসংবাদ দিলেন ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম লাভ করার এবং ইসহাকের উত্তরাধিকার হইবেন ইয়া'কুব (আঃ), সেই সংবাদও ফেরেশতাগণ দিলেন!" সুতরাং যখন ইসহাকের জন্মের পূর্ব হইতে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ছিল যে, ইসহাকের বংশ ও উত্তরাধিকারী চলিবে– ইহার অর্থ এই ছিল যে, ইসহাক জীবিত থাকিবেন। তখন সেই আল্লাহর তরফ হইতে ইসহাকের কোরবানী করার আদেশ হইতে পারে না।

তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; ইহুদী-নাসারাগণ ঐ কিতাবদ্বয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদীরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশকে আল্লাহর নামে কোরবান হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য তওরাত কিতাবে এই প্রসঙ্গটি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন তিনি ইসহাক (আঃ)। ইহা তাহাদের জঘন্য মিথ্যাসমূহের একটি অন্যতম মিথ্যা।

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়া

হযরতের দাদা– আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মোত্তালেব একটি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বিশেষ স্মৃতি বরকত ও মঙ্গল-ভাণ্ডার যমযম-কূপ বহু দিন হইতে মাটির নীচে লুপ্ত হইয়া রহিয়াছিল; আবদুল মোত্তালেবের হাতে তাহার বিকাশ হইয়াছিল। গায়েবী সাহায্যে তিনি তাহার আবিষ্কারক হওয়ার গৌরবে ধন্য হইলেন।

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, মক্কা নগরীর আদি অধিবাসী ছিল "জুরহুম গোত্র"– যাহারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার সময়েই মক্কা এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যেই ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। মক্কা নগরীর কর্তৃত্ব এই গোত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহাদের আমল-আখলাক বিনষ্ট হইলে আল্লাহ তাআলার শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়নকারী এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণ তাহাদের উপর আসিল। তখন তাহাদের মধ্যে "আম্‌র ইবনুল হারস ইবনুল মেজমাম" নামক ব্যক্তি তাহাদের সর্দার ছিল। শত্রুর আক্রমণে তাহারা পলায়নে বাধ্য হইলেন তাহাদের সর্দার আমর ইবনুল হারস তাহার বিশেষ বিশেষ ধন-রত্ন এবং অস্ত্র শস্ত্র যমযম কূপের মধ্যে ফেলিয়া কূপ ভরাট করতঃ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিল, যেন তাহার কোন নিদর্শনও দেখা না যায়– এইভাবে ঐ কূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (যোরকানী, ১– ৯২)

পুরাতন ইতিহাসরূপে যমযম কূপের চর্চা ছিল, কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন ছিল না। খাজা আবদুল মোত্তালেব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু সঠিক কোন নিদর্শন তাঁহার জানা ছিল না, তাই আদেশ কার্যকরী করিতে পারিতেছিলেন না; স্বপ্নও পুনঃ পুনঃ দেখিতেছিলেন। শেষবার স্বপ্নে নিদর্শনও পাইলেন যে, প্রভাতে এক স্থানে পিপীলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে, কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে। আবদুল মোত্তালেবের তখন একটি মাত্র পুত্র ছিল– হারেস। ভোরবেলা আবদুল মোত্তালেব হারেসকে সঙ্গে লইয়া কা'বা ঘর এলাকায় আসিয়া ঐ নিদর্শন– পিপীলিকার বাসা এবং কাকের মাটি খোঁড়া দেখিতে পাইলেন; ঐ জায়গাটিতে মক্কাবাসীরা সেই আমলে তাহাদের দেব-দেবীর নামে জীব বলিদান করিত। আবদুল মোত্তালেব হারেসকে লইয়া ঐ স্থান খনন আরম্ভ করিলেন। কোরায়শের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিল; শেষ পর্যন্ত হারেসকে বাধার মোকাবিলায় দাঁড় করাইয়া মাটি খনন আরম্ভ করিলেন। অল্প কিছু খননের পরই কূপের বেড় বাহির হইল; আব্দুল মোত্তালেব আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। পূর্ণরূপে আবিষ্কারের পরে তাহাতে তৈয়ারী দুইটি স্বর্ণ হরিণ এবং কতিপয় তরবারি ও লৌহবর্ম পাওয়া গেল। উক্ত এলাকার আদি নিবাসী জুরহুম গোত্র ঐসব জিনিস তথায় রাখিয়াছিল। এই সব মালামালের ব্যাপারেও কোরায়েশের লোকজনের সহিত আব্দুল মোত্তালেবের কলহ বাধিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আবদুল মোত্তালেব ঐসব মালামাল সম্পর্কে তাঁহার নিজের ও কোরায়শের লোকজনের এবং কা'বা গৃহের নামের ভিন্ন ভিন্ন লটারি করার প্রস্তাব দিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া লটারী করিল। তখন আবদুল মোত্তালেব আল্লাহর নিকট আরাধনা করিতেছিলেন। লটারিতে স্বর্ণ হরিণদ্বয় কা'বা গৃহের নামে উঠিল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালেবের নামে আসিল; কোরায়েশগণ ফাঁকা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩০ নং হাদীছে যে কা'বা শরীফের পোতায় প্রোথিত স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ আছে, সেই ধন-রত্নের মধ্যে উক্ত স্বর্ণ-হরিণদ্বয়ও রহিয়াছে। তারপর যমযম কূপের স্বত্বাধিকার নিয়াও আব্দুল মোত্তালেবের সহিত কোরায়শদের বিরোধ দেখা দিল। তাহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ এক গণক-ঠাকুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পানির অভাবে পিপাসায় তাহাদের সকলের মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা মৃত্যু প্রহরের অপেক্ষায় এক স্থানে জড় হইয়া পতিত ছিল। আবদুল মোত্তালেব সকলকে বলিলেন, হাত-পা গুটাইয়া মৃত্যুবরণ করা কাপুরুষের লক্ষণ; শক্তি থাকা পর্যন্ত পানির তালাশে বাহির হওয়া কর্তব্য; আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে কোথাও পানির খোঁজ দিতে

পারেন। সেমতে সকলেই তথা হইতে পানির তালাশে যাত্রা করায় তৎপর হইল। আবদুল মোত্তালেবও স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিলেন; বাহন উটটি তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের নীচ হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পানি পান করিল এবং সকলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় কোরায়শের লোকজন আবদুল মোত্তালেবের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িল এবং সকলে একবাক্যে বলিল, হে আব্দুল মোত্তালেব! আপনার সহিত আমাদের আর কোন বিরোধ নাই, যেই মহান আপনাকে এই মরুভূমিতে পানি দান করিয়াছেন, তিনিই আপনাকে যমযম কূপও দান করিয়াছেন; তাহার উপর একমাত্র আপনারই অধিকার থাকিবে। সেমতে হাজীদিগকে যমযম কূপের পানি পান করাইবার সেবা সৌভাগ্য বংশ পরম্পরা আবদুল মোত্তালেবের বংশেরই নির্ধারিত থাকিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৮৫৩ হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এই সব ঘটনা ঘটিবার সময় আব্দুল মোত্তালেব একটি মাত্র পুত্রের পিতা ছিলেন। তিনি যমযম কূপের ব্যাপারে কোরায়শদের বিগত বিরোধে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল অধিক পুত্র লাভের; যাহাতে তিনি কোরায়শদের বিরোধ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হইতে পারেন। সেমতে তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার দশটি পুত্র লাভ হইলে এবং তাহারা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে একটি পুত্র আমি আল্লাহর নামে কোরবানী করিব।

আল্লাহ তাআলার কুদরত– আবদুল মোত্তালেব একে একে দশটি পুত্র লাভ করিলেন; সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হইলেন আবদুল্লাহ– যিনি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা। আবদুল মোত্তালেবের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক আদর-সোহাগের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ; তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির উপরই আবদুল মোত্তালেবের মান্নত বা প্রতিজ্ঞা পূরণ করা জরুরী হইয়া পড়িল। সেমতে একদিন আবদুল মোত্তালেব পুত্রদেরকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মান্নতের মর্ম জ্ঞাত করিলেন এবং কোরবানীর জন্য একজনকে নির্ধারিত করার উদ্দেশে লটারি করিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস– লটারিতে কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠিল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণে প্রস্তুত হইলেন এবং আবদুল মোত্তালেব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে লইয়া কোরবানীর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে কোরায়শদের লোকজন বিশেষতঃ আবদুল্লাহর মাতুল আবদুল মোত্তালেবকে বাধা দিয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে সর্বশেষ প্রচেষ্টায় বাধ্য না হইয়া এই কার্য আমরা সম্পন্ন করিতে দিব না।

সেকালে মাদীনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরানী ছিল; সাব্যস্ত করা হইল সেই ঠাকুরানীর নিকট হইতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। আবদুল মোত্তালেব কতিপয় লোকসহ সেই ঠাকুরানীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুরানী ঘটনা শ্রবণান্তে বলিয়া দিল, অদ্য তোমরা চলিয়া যাও; পরে পুনরায় সাক্ষাত করিও। আবদুল মোত্তালেব ঠাকুরানীর নিকট হইতে আসিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরদিন পুনরায় ঠাকুনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালের প্রথানুযায়ী একজন মানুষের জীবন বিনিময় দশটি উট ছিল; অতএব অদ্য ঠাকুরানী তাহাদের কাম্য বিষয়ের ফয়সালা এই শুনাইল যে, দশটি উট এবং আব্দুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি করিবে; যদি উট দলের দিকে কোরবানী করা সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহর বদলে দশটি উট কোরবানী করিবে, আর যদি এই লটারিতেও কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠে, তবে ঐ দশটি উটের সহিত আরও দশটি উট যোগ করিয়া বিশটি উট ও আব্দুল্লার মধ্যে পুনঃ লটারি করিবে। এইরূপে যাবৎ কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নাম না আসিবে প্রতিবার দশটি করিয়া উট যোগ করতঃ লটারি করিতে থাকিবে– যত সংখ্যার উপর যাইয়া লটারিতে উট কোরবানীর নাম আসিবে সেই সংখ্যক উট কোরবানী করিয়া দিলে আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়া যাইবে।

আবদুল মোত্তালেব এই ফয়সালা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঐরূপে লটারির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। নয় বার পর্যন্ত লটারিতে আবদুল্লাহর নামই আসিতে লাগিল; পুনরায় দশ দশ উট বর্ধিত করিলে উটের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল এবং দশমবার লটারি দেওয়া হইল; এইবার উটের নামে লটারি আসিল।

কোরায়শের লোকজন সকলেই আনন্দিত হইল এবং বলিল, হে আবদুল মোত্তালেব, ধন্য হও! পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা তোমার পক্ষে সফল হইয়াছে। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি আশ্বস্ত হইব না যাবত একশত উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে তিনবার লটারি করিয়া না দেখি। এই বলিয়া আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহর দরবারে আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং লোকেরা দ্বিতীয়বার লটারি করিল; এইবারও কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নামই আসিল। তৃতীয়বার আবার ঐরূপে আবদুল মোত্তালেব আরাধনায় লিপ্ত হইলেন এবং এইবারও লটারিতে উটের নামই আসিল। আব্দুল মোত্তালেব সন্তুষ্ট চিত্তে একশত উট কোরবানী করিয়া সম্পূর্ণ গোশ্‌ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।*

(সীরতে ইবনে হেশাম, ১৪৩-১১৫৫)

এইভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)- পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তাআলার নামে কোরবানী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে কোরবানী হওয়া হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদার ভাগী হইয়াছিলেন. যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। তদ্রূপ আব্দুল মোত্তালেব ও আবদুল্লাহ উভয় পিতা-পুত্র আল্লাহর নামে কোরবানীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গের বিকাশ সাধনে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। সেই আব্‌দিয়তের রক্তধারাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে আসিয়াছিল- যাহার ইঙ্গিত দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন- انا ابن الذبيحين -অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই জন এরূপ ছিলেন যাঁহারা আল্লাহর জন্য কোরবানী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের রক্তধারা আমার মধ্যে প্রবাহমান।

হযরতের বংশের সম্পর্ক মদীনার সহিত

আল্লাহ তাআলার শান- হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাল কাটিবে মদীনায়, এমনকি শেষ শয়নও মদীনায়ই হইবে। সুতরাং পূর্ব হইতেই মদীনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন অতি বাঞ্ছনীয়। সেমতে কুদরতে এলাহী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের পিতা হাশেম- যিনি হযরতের গোত্রশাখা বনু হাশেমের মূল, তিনি মদীনার এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বন নাজ্জার বংশের "সালমা" নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযরতের পিতামহ হাশেম কোন প্রয়োজনে মদীনায় আসিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব এই সালমার গর্ভেই জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্মের পর হাশেম মক্কায় চলিয়া আসেন, কিন্তু শিশু আবদুল মোত্তালেব মদীনায়ই মাতার নিকট থাকিয়া যান। আব্দুল মোত্তালেব মদীনায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে হাশেম মারা গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা মোত্তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবার জন্য মদীনায় আসিলেন; সালমা পুত্রকে দিতে রাজি হইতেছিল না, পুত্রও তাহার অনুমতি ছাড়া যাইতে রাজি নহে। মোত্তালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে না লইয়া বাড়ী ফিরিব না। অবশেষে মোত্তালেব তাঁহার চেষ্টায় সফল হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার লোকেরা হাশেমের এই পুত্রকে কেহ কোন সময় দেখে নাই, তাই প্রথমে তাহারা ছেলেটিকে মোত্তালেবের সহিত দেখিয়া ভাবিল, ছেলেটি মোত্তালেবের দাস- সেই মর্মে ছেলেটিকে "আবদুল মোত্তালেব- মোত্তালেবের দাস" আখ্যায়িত

০ উক্ত ঘটনার পর হইতে মানুষের জীবন বিনিময় একশত উট প্রদানের প্রচলন হইয়া পড়ে। এমনকি ইসলামী শরীয়তের বিধানেও যে ক্ষেত্রে "কেসাস" তথা খুনের বদলা খুন হয় না- যেমন, অনিচ্ছাকৃত খুন কিম্বা খুনের বিনিময়ে বাদী পক্ষ যদি জীবন বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে একশত উট দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। ফেকাহ শাস্ত্রে ইহাকেই "দিয়াত" বলা হয়।

করিল। মোত্তালেব লোকদিগকে প্রকৃত খবর জানাইয়া বলিলেন, ছেলেটি আমার ভ্রাতা হাশেমের পুত্র– তাহার নাম "শায়বাতুল হাম্‌দ" কিন্তু, "আবদুল মোত্তালেব" আখ্যা আর মুছিল না। আজও হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব নামেই পরিচিত।

হাশেমের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মদীনাবাসীগণ মক্কার কোরায়শ বংশীয় বনু হাশেমকে ভাগিনার গুষ্টি গণ্য করিয়া থাকিত। (তৃতীয় খণ্ড– ১৪৩১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের শাখা গোত্র বনু হাশেমের বৈশিষ্ট্য

কোরায়েশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। কা'বা শরীফের উপর তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব ছিল, হাজীদের সর্বপ্রকার সেবা বিশেষতঃ তাঁহাদের পানির যোগাড় তাঁহারাই করিতেন। আবদে মনাফের পরে এইসব বৈশিষ্ট্য হাশেমের উপর ন্যস্ত হয়। হাশেম দানশীল ছিলেন; তিনি হাজীদিগকে রুটিও খাওয়াইয়া থাকিতেন। এমনকি এক বৎসর কোরায়শদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; কাহারও সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না; হাশেম তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া হাজীদের সেবার ব্যবস্থা একাই করিলেন। হাশেমের মৃত্যুর পর হাজীদের সেবার কাজ মোত্তালেব গ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব হাজীদের পানি এবং সমুদয় সেবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, কোরায়শদের উপর সর্বপ্রকারের কতত্ব-নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন। তাঁহার জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই জন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ ক্ষেত্রে আবদুল মোত্তালেবের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াছেন। (তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের মাতুল

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কীয় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইলে পর তাঁহার বিবাহের জন্য আবদুল মোত্তালেব প্রস্তুত হইলেন। আব্দুল মোত্তালেব কোরায়শদের প্রধান, সুখ্যাতির আধার; খাজা আবদুল্লাও কোরবানীর ঘটনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যা দেওয়ার জন্য কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেই প্রতিযোগী হইলেন।

কোরায়শদের শাখা গোত্র বনু যোহরা ঐ সময় তাহার সরদার ছিলেন ওয়াহ্‌ব; তাহার এক সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল "আমেনা"। আবদুল মোত্তালেব স্বয়ং ওয়াহ্‌বের নিকট যাইয়া আবদুল্লাহর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমেনার সৌভাগ্যের চন্দ্রোদয় হইল; খাজা আবদুল্লাহর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবি আমেনার পিতা ওয়াহ্‌বের বংশ তালিকা এই– ওয়াহ্‌ব, পিতা আবদে মনাফ, পিতা যোহরা, পিতা কেলাব। (সীরাতে ইবনে হেশাম, ১৫৬)

হযরতের বংশ তালিকায় তাঁহার ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা ছিলেন "কেলাব"। অতএব হযরতের পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারাই কোরায়শ বংশের "কেলাব" নামীয় পিতায় মিলিত ছিল।

° ওয়াহ্‌বের পিতা আব্‌দে মনাফ এবং হযরতের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পিতা আব্‌দে মনাফ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মাতার বংশের আব্‌দে মনাফ হইলেন যোহরা পুত্র আব্‌দে মনাফ আর পিতার বংশের আব্‌দেমনাফ ছিলেন উক্ত আব্‌দে মনাফের পিতা যোহরা ভ্রাতা কুসাইর পুত্র। অর্থাৎ হযরতের ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা "কেলাব"– তাঁহার দুই পুত্র ছিল (১) কুসাই (২) যোহরা। "কুসাইর এক পুত্রের নাম ছিল আব্‌দে মনাফ; তাহার বংশধরই হযরতের পিতা আবদুল্লাহ। তদ্রূপ যোহরার এক পুত্রের নামও আব্‌দে মনাফ ছিল; তাহার বংশধরই হযরতের নানা ওয়াহ্‌ব। (সীরাতে ইবনে হেশাম–১০৪)

হযরতের পিতৃবিয়োগ

মতভেদ থাকিলে সাধারণত ঐতিহাসিকগণের সাব্যস্ত ইহাই যে, নবীজী (সঃ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার পিতা খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়- (১) আবদুল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মধ্যপথে অসুস্থ হইয়া স্বীয় পিতার মাতুল দেশ মদীনায় গিয়াছিলেন। সেই অসুস্থতাতেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তথায়ই তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন। (২) মক্কায় খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ায় আবদুল মোত্তালেব স্বীয় মাতুল দেশ খেজুরের এলাকা মদীনায় খাজা আবদুল্লাহকে পাঠাইয়াছিলেন খেজুরের জন্য । তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই রোগেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তারীখে তাবারী, ২-৮)

খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল এবং নবী (সঃ) দুই মাস কালের মাতৃগর্ভে ছিলেন; কাহারও মতে পিতার মৃত্যুকালে নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই মাস বাকী ছিল।

(যোরকানী, ১- ১০৯)

সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা

ধরাপৃষ্ঠে হযরতের আগমন উপলক্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছিল- যাহা দৃষ্টে মনে হয় যেন খোদায়ী কুদরতের পক্ষ হইতে সত্যের বিকাশ এবং তাহার প্রাধান্য মহাসত্যের বাহক তথা হযরতের শুভাগমনকে অভ্যর্থনা জানাইতেছিল।

তন্মধ্যে আস্হাবে ফীল বা হাতীওয়ালা রাজা আব্‌রাহার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সূরা "ফীল" বা আলাম তারার মধ্যে এই ঘটনার দিকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইয়ামানের শাসনকর্তা খৃস্টান ধর্মীয় আব্‌রাহা কা'বা শরীফের দিক হইতে লোকদের আকর্ষণ ফিরাইবার জন্য ইয়ামানের রাজধানী "সানা" শহরে অতি জাঁকজমকপূর্ণ একটি গির্জা তৈয়ার করিয়াছিল। আরববাসী একজন লোকের দ্বারা তাহা কদর্য বা ভস্মীভূত হইলে আব্‌রাহা আরবীয় কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপিয়া উঠে এবং তাহা ধ্বংস করার জন্য হস্তী সম্বলিত বাহিনী লইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দুই স্থানে কা'বা শরীফের ভক্তগণ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার বিরাট শক্তির মোকাবিলায় সকলেই পরাজিত হয়। আব্‌রাহা তায়েফের পথে মক্কার অনতিদূরে ''মোগাম্মেস' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় অবস্থান করিল। আব্‌রাহা তথা হইতে তাহার একজন জেনারেলকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কায় পাঠাইল; সেই জেনারেল মক্কায় আসিয়া ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গেল। মক্কার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের দুই শত বা ততোধিক উটও লুণ্ঠিত হইল। মক্কার লোকেরা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই পরিমাণ শক্তি মোটেই ছিল না।

অতঃপর আব্‌রাহা দ্বিতীয় একজন লোক পাঠাইল এই কথা বলিয়া যে, তুমি মক্কায় যাইয়া তথাকার সর্দারকে খোঁজ করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি আসিয়াছি শুধু কা'বা গৃহ ভাঙ্গিবার জন্য। তাহারা যদি আমাকে এই কাজে বাধা না দেয় তবে রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চায় তবে সেই সর্দার যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে।

আব্‌রাহার দূত মক্কায় আসিয়া তৎকালীন তথাকার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে আব্‌রাহার পয়গাম পৌঁছাইল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমরা

আব্‌রাহার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। আর কা'বা গৃহ আল্লাহর ঘর; আল্লাহ যদি তাঁহার ঘর রক্ষা করেন করিবেন। আর যদি তিনি আব্‌রাহাকে সুযোগ দেন তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। আব্‌রাহার দূত বলিল, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন; তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বলিয়াছেন।

আব্‌রাহার সহিত আবদুল মোত্তালেবের সাক্ষাত ঘটিল। দোভাষীর মাধ্যমে আব্‌রাহা আবদুল মোত্তালেবকে তাঁহার কোন আব্‌দার থাকিলে প্রকাশ করিতে বলিল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনার লোক আমার পশুপাল নিয়া আসিয়াছে তাহা প্রত্যার্পণ করা হউক। আব্‌রাহা বলিল, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার মন আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আপনি সামান্য মালের জন্য আমার নিকট আব্‌দার করিলেন, আর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ঘর কা'বার জন্য কোন আব্‌দার করিলেন না। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, দেখুন! আমি পশুপালের মালিক, তাই আমি পশুপালের কথা বলিলাম। আর কা'বা গৃহের মালিক (আমি নহি, অন্য) একজন আছেন; তিনি হয়ত তাহা ভাঙ্গায় বাধা দিবেন। আব্‌রাহা দর্পের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কাহারও বাধা মানিব না। আবদুল মোত্তালে বলিলেন, তাহা আপনি জানেন আর তিনি জানেন। অতঃপর আব্‌রাহা আবদুল মোত্তালেবের পশুপাল ফিরাইয়া দিল।

আব্দুল মোত্তালেব মক্কায় আসিয়া লোকদিগকে একত্র করিল এবং সমবেতভাবে কা'বার দ্বারে যাইয়া পরওয়ারদেগারের নিকট আরাধনা করিল; আব্‌রাহা বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। আবদুল মোত্তালেব কা'বা দ্বারের কড়া ধরিয়া আবেগপূর্ণভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহ! একজন মানুষ তাহার মাল-সামান রক্ষা করিয়া থাকে; আপনি আপনার ঘর ও ইহার সম্মান রক্ষা করুন। আগামীকল্য শত্রু এবং তাহার শক্তি যেন আপনার শক্তির উপর জয়ী হইতে না পারে। অতঃপর আবদুল মোত্তালেব লোকদেরকে লইয়া পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিলেন এবং কা'বার সহিত আবরাহা কি করে তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবরাহা দম্ভের সহিত সৈন্যবাহিনী লইয়া মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রধান হাতীটির নাম "মাহমুদ"– সেই হাতীটি সর্বাগ্রে চলিবে, কিন্তু হাতীটি মক্কার পথে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, বসিয়া পড়ে। অন্য যেকোন দিকে চালাইলে সে চলে, কিন্তু মক্কার দিকে চলে না। এই বিভ্রাটের মধ্যেই হঠাৎ সমুদ্রের দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এক শ্রেণীর পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল; প্রতিটি পাখীর মুখে ও দুই পায়ে মোট তিনটি কাঁকর। পাখীগুলি আবরাহা বাহিনীর উপর সেই কাঁকরসমূহ ফেলিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলার কুদরত– যেকোন সৈন্য বা হাতীর উপর কাঁকর পতিত হইলেই সে ধ্বংস হইয়া যাইত। এইভাবে সেই বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হইল এবং অবশিষ্ট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা পবিত্র কোরআনে সূরা আলাম-তারায় নিম্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে–

"হে প্রিয়নবী! আপনি কি খবর রাখেন না কি অবস্থা করিয়াছিলেন আপনার পরওয়ারদেগার হাতীওয়ালা বাহিনীর? তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টা কি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন না? তাহাদের উপর তিনি পাঠাইয়াছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। সেই পাখী তাহাদের উপর ফেলিতেছিল শক্ত কাঁকর। ফলে তিনি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।"

ঘটনার সত্যতা প্রমাণে একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিবার মাত্র ৪০ হইতে ৫২ বৎসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের সূরা "আলামতারা" নাযিল হইয়াছিল; তখন উক্ত ঘটনার সময়কালের অনেক লোকই আবরাহার দেশ ইয়ামান এবং ঘটনার শহর মক্কায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ছিল। তাহাদের বর্তমানে পবিত্র কোরআনের উক্ত সূরা প্রচারিত হইয়াছে; তাহারা সকলেই কোরআনের বিরোধী দলভুক্ত ছিল। যদি কোরআনের বর্ণনায় বিন্দুমাত্রও অবাস্তবতা থাকিত, তবে নিশ্চয় তাহারা প্রতিবাদ করিত এবং সেইরূপ কোন প্রতিবাদ হইয়া থাকিলে তাহা মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না; প্রতি যুগেই কোরআনের শত্রুর আধিক্য ছিল।

আবরাহা বাহিনীর বহু সংখ্যক ধ্বংস এবং অবশিষ্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বরং আবরাহার গায়েও কাঁকর পড়িয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হালাক হয় নাই। তাহার* শরীরে পচন লাগিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই ঘা হইতে সর্বদা পুঁজ প্রবাহিত হইত; এইরূপ ঘৃণিত ও কদর্য অবস্থায় দীর্ঘ দিন ভোগার পর অবশেষে বক্ষ ফাটিয়া কলিজা বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ঘটনায় সমগ্র আরবে কোরায়শ বংশের প্রভাব অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকত ছিল; হযরত (সঃ) তখন দুনিয়াতে পদার্পণের প্রথম ধাপে তথা মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার ৫০ বা ৫৫ দিন পর হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের জন্ম।

বেলাদত বা শুভ জন্ম

এই সুসজ্জিত বিশ্ব বসুন্ধরা যেই মহানের প্রদর্শনী (Exhibition), নিখিল সৃষ্টি যেই মহান সৃষ্টের বিকাশ উদ্দেশে উন্মুখ, ছয় হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে এই ধরণী যেই মহামানবের প্রতীক্ষায়, ভুবন-কাননে যেই ফুলের আকাঙ্ক্ষায় তাকাইয়াছিল সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি; আজ সেই মহানের শুভ পদার্পণ হইবে এই ধরণীতে, সেই মহাফুলের কুঁড়ি জন্ম নিবে এই উদ্যানে।

হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম শুভ সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে মহানবী, অগণিত নবীগণের পরিক্রমা শেষ করিয়া সকল জোগাড় আয়োজন সমাপ্তে বিশ্ব সভার মহাসমাবেশকে অলঙ্কৃত করিবেন যে মহিমান্বিত মহাপুরুষ– আজ সেই মহামহিমের শুভাগমন হইবে বিশ্ব ভুবনে।

চন্দ্রে মাস রবিউল আউয়াল ১২, ১০, ৯, ৮ বা ২ তারিখ সোমবার দিন নহে, রাত্রও নহে; আলো-আঁধারে সোবহে সদেকের শান্ত-শুভ্র আলোক-রেখা গগণ-প্রান্তকে মনোরম করিয়াছে, স্নিগ্ধ বায়ুর শীত প্রবাহ ধরাপৃষ্ঠকে প্রফুল্ল আমোদিত ও পুলকিত করিয়াছে, এই অপরূপ মুহূর্তে বিবি আমেনা প্রসব অবস্থা অনুভব করিলেন; অভিনন্দন অভ্যর্থনার আয়োজন চলিল গগনে ভুবনে। আল্লাহ তাআলা আদেশ করিলেন ফেরেশতাগণকে, আজ খুলিয়া দাও আসমানসমূহের সকল দরজা; খুলিয়া দাও সমস্ত বেহেশতের সকল দরজা (যোরকানী, ১–১১১)

বিবি আমেনা দেখিলেন, তাঁহার কুটির অপূর্ব নূরে উজালা হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, এক অপরূপ দৃশ্য– নিজ গোত্রীয় আব্‌দে মনাফ বংশের নারী আকৃতির দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্ট কতিপয় স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী মহিলা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত; তাঁহারা বিবি আমেনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিবি আমেনা অবাক! কাহাকেও কোন খবর দেই নাই, এই মুহূর্তে ইহারা কিরূপে খোঁজ পাইলেন? কোথা হইতে আসিলেন? কাহারা ইহারা? সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দানে তাঁহার বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি বিবি আছিয়া, বিবি মারইয়াম* এবং কতিপয় বেহেশতী হুর। এতদ্ভিন্ন বিবি আমেনা ঐ শুভ মুহূর্তে আরও অলৌকিক বহু কিছু দেখিতেছিলেন। (যোরকানী–১১১২)।

বিবি আমেনার বর্ণনা– প্রসব ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ধরণীর বুকে দেখিতে পাইলাম; ভূমি স্পর্শকালে তিনি উভয় হাতের উপর ভর করিয়া সেজদারত ছিলেন। (যোরকানী ১–১১২)। তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল; তাঁহার দেহ মোবারক হইতে মেশকের সুবাস ছড়াইতেছিল! (ঐ ১১৫)

---

* কাঁকরের ক্রিয়ায় মূল রোগ যাহার হইয়াছিল "বসন্ত" এবং বিশ্বে বসন্ত রোগের আরম্ভ ঐ সময় হইতেই হইয়াছিল; বসন্তের দানা তাহার শরীরে পচন লাগিয়াছিল। (যোরকানী– ৮৮)

* বিবি আছিয়া এবং বিবি মারইয়ামের আগমন অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবি আছিয়ার স্বামী "ফেরআউন" চিরজাহান্নামী এবং তিনি হইবেন উচ্চস্তরের বেহেশতী। আর বিবি মারইয়ামের কোন স্বামী ছিল না। তাঁহারা উভয় বেহেশতে নবীজীর চিরসঙ্গিনী হইবেন।

ঐ সময় এক অপূর্ব শুভ্র মেঘ সদৃশ আলোমালা আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ধ্বনিত হইল– "জলে-স্থলে সারা জাহানে তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া নিয়া আঁস"; কিছু সময় তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিলেন। (ঐ ১–১১২) তিনি যখন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন তাঁহার সঙ্গে এক অসাধারণ নূর বা আলো নির্গত হইল, যদ্দারা পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র জগত যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই আলোতে সুদূর সিরিয়ার ইমারতসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।* হযরত (সঃ) মাতৃগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাক-পবিত্র অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন। (ঐ ১১৭)

নবীজীর নূরে সারা বিশ্ব আলোকিত হইবে, তাই তাঁহার শুভাগমন লগ্নে এই নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী (সঃ) নিজেই সেই নূরের সত্তা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ -

অর্থ ঃ "আসিয়া গিয়াছে আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের নিকট এক মহান নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব; এই নূর ও কিতাব দ্বারা আল্লাহ তাআলা শান্তির পথে অগ্রগামী করিবেন ঐ লোকদেরকে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং তাহাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া নিবেন আলোর দিকে নিজ দয়ায়।" (পারা–৬, রুকু–৭)

আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে সে নূর হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। সুতরাং তাঁহার শুভাগমনের সঙ্গে নূর বা আলোর বিকাশ চমৎকার সামঞ্জস্যময় বটে। উক্ত আলোতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হওয়াও সুন্দর অর্থই রাখে। বহির্বিশ্বে এই আলোর বিকাশ সর্বপ্রথম সিরিয়ায়ই হইয়াছিল। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম সিরিয়া দেশই জয় করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রসূল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে। যাঁহার খাতিরে আরশ-কুরসী, লৌহ-কলম, আসমান-যমীন, মানুষ-ফেরেতা সৃষ্টি; আজ তিনি আসিয়াছেন শত ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্ব হইতে এই ধূলির ধরণীতে। তাই হর্ষে আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাঁহাকে

* সমালোচনা ঃ মোস্তফা চরিতে বিবি আমেনার এই নূর বা জ্যোতি দর্শনকে স্বপ্নের দেখা বলা হইয়াছে– ইহা নিছক ভুল। বলা হইয়াছে– "বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।" এই উক্তি ডাহা মিথ্যা; পূর্বাপর কেহই এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলেন নাই। সীরাত শাস্ত্রে পাঁচশত বৎসরের অধিক পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী কর্তৃক সঙ্কলিত "মাওআহেবে লুদুনিয়্যাহ" কিতাবে (পৃষ্ঠা–২২) একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এই জ্যোতির বিকাশ বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা–১১৬) ঐ জ্যোতি দর্শন স্বপ্ন নহে, বরং বাস্তব বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাহার "নশরুত্ তীবে" (পৃষ্ঠা–১৬) এবং মুফতী শফী সাহেব তাঁহার "সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়ায়" (পৃষ্ঠা–২৫) ঐ জ্যোতি দর্শনকে বাস্তব বলিয়াছেন। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাদীছ শাস্ত্রের হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বাস্তবরূপে উক্ত জ্যোতি দর্শনের বর্ণনাকে সহীহ-শুদ্ধ-সঠিক বলিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে মোহাদ্দেসগণের অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (যোরকানী, পৃষ্ঠা–১১৬)।

এমতাবস্থায় মোস্তফা চরিতের উল্লিখিত উক্তি অলীক ও অমূলক হওয়ায় সন্দেহ থাকে কি? পরিতাপের বিষয়, এই অলীক ও অমূলক মতটাকে প্রমাণিত করার জন্য দুইটি আরবি বাক্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে– উভয়টিই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। একটি বাক্যে বিবি আমেনার স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে। এই স্বপ্ন ত বিবি আমেনার গর্ভধারণ সময়ের ছিল বলিয়া সীরাতে ইবনে হেশামে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসবের সময়ও ঐরূপ নূর দেখা সম্পর্কে। অপর বাক্যটি একটি হাদীছ; তাহাতে --- "রুয়া" শব্দ আছে, তাহার অনুবাদ "স্বপ্ন দর্শন" প্রবঞ্চনা ও সত্যের অপলাপ বৈ নহে। এই শব্দটি চাক্ষুষ এবং প্রত্যক্ষরূপে দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী, পৃষ্ঠা–৬৮৬)

পাঠক! একটি আশ্চর্যজনক উক্তির কৌতুক উপভোগ করুন। মরহুম খাঁ সাহেব বিবি আমেনার উক্ত জ্যোতি দর্শন স্বপ্নযোগের ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উল্লিখিত "রুয়া" শব্দের অর্থ স্বপ্নে দর্শন সূত্রে নবীজীর উক্তিরূপে হাদীছটির অনুবাদ করিয়াছেন– "এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন..."। সন্তান প্রসবের কঠিন অবস্থায় প্রসূতির এরূপ গভীর ও মধুর নিদ্রা আসিবে যে, সে তাহাতে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিবে– এই শ্রেণীর হাস্যকর কথা বলা মরহুম খাঁ সাহেবের ন্যায় হাতুড়ে লোকের পক্ষেই সম্ভব। "মিথ্যার বেসাতিধারীদের স্মরণশক্তি হয় না।"

নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা	আল্লাহর নবী তুমি; তোমাকে সালাম!
ইয়া রসূল সালামু আলাইকা	আল্লাহর রসূল তুমি; তোমাকে সালাম!!
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা	আল্লাহর হাবীব তুমি; তোমাকে সালাম!
ছালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা	তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম!!!

হযরতের শুভ জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী

হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষে অনেক অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা এই–

পারস্যের অগ্নিপূজকগণ তাহাদের একটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডলী এক হাজার বৎসর হইতে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে হঠাৎ সেই হাজার বৎসরের অগ্নিকুণ্ডলী নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর বহু মূর্তি ঐ রাত্রে অধঃমুখে পতিত হইয়াছিল, কা'বা গৃহের দেবমূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গিত ছিল যে, এক আল্লাহর এবাদত-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং অন্যান্য বস্তুনিচয়ের পূজার অবসান অত্যাসন্ন। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহত রাজশক্তি পারস্য সম্রাটের শাহী মহলে ঐ রাত্রে ভূমিকম্প হয় এবং তাহাতে রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, কাফেরী শক্তির উপর ভূকম্পন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার পতন আসন্ন। আরও অলৌকিক ঘটনা এইরূপ ঘটে যে, পারস্যের এক বৃহৎ হ্রদ ঐ রাত্রে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়। তাহাতে আর পানি আসে নাই। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিরিয়া এলাকার ঐরূপ একটি জলাশয়েও হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট পরিবর্তন আসে, তাহার পানি অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। ইঙ্গিত ছিল যে, পারস্য ও রোমর তৎকালীন বৃহৎ কাফেরী শক্তিসমূহের শৌর্য-বীর্যে ভাঁটা আসিয়া গেল; ঐসব আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।* (যোরকানী, পৃষ্ঠা–১২১)

গগন-ভুবনের স্বাগত ধ্বনি, নিখিলের অভিনন্দন-অভ্যর্থনা এবং অলৌকিকের মহাসমারোহ-শোভাযাত্রার মাঝে শুভাগমন হইল মহান অতিথির– যাঁহার আগমনপানে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল সারা প্রকৃতি, অধীর আগ্রহে প্রহর গুনিতেছিল সারা সৃষ্টি। ধরণীপৃষ্ঠে শুভজন্ম তথা রূহানী দুনিয়া হইতে বস্তু জগতে পদার্পণ এবং নূরানী আত্মার নূরানী দেহসহ জড় দেহের আবরণে আবির্ভাব হইল পেয়ারা

সমালোচনা ঃ মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মোস্তফা চরিতের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের মস্ত বড় বাতিক তিনি নবীগণের মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। এই বাতিকেই তিনি কোরআন-হাদীছে হাতুড়ে হইয়াও বহু ঐতিহাসিক সত্যকে এবং সহীহ হাদীছকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাধিবশে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভ জন্মোপলক্ষের উল্লিখিত ঘটনাবলী নগ্ন ও অভদ্র ভাষায় অবাস্তব সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রুগ্ন রুচি এইসব ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভালবাসে না বিধায় এইসব ঘটনার উল্লেখ এমন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আকারে করিয়াছেন যে, পাঠক ঐসব সত্য যেন আপনা হইতেই বিশ্রী, ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ গণ্য করিয়া নেয়। সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কত জঘন্য অপকৌশল ইহা!

আরও অতি দুঃখের বিষয়– তিনি এইসব ঘটনা উল্লেখের সহিত নিজ হইতে দুই-একটা আজগবী অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন – "সমস্ত রাজসিংহাসন উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতেছিল" ইত্যাদি (পৃষ্ঠা–১৮৮)।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭ পৃষ্ঠায় "বলিতে লজ্জা হয়" বলিয়া এমন একটা বিশ্রী অশালীন অশ্লীল কুরুচিময় বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই গড়ানো কথা হইবে। আমরা সীরাতের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিবরণ দেখি নাই।

চতুর খাঁ সাহেব এইসব অলীক ও লজ্জাকর গর্হিত কথাগুলিকে সত্য ইতিহাসের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন অতি এক জঘন্য কুমতলবে। যেন সাধারণ পাঠক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য ইতিহাসগুলিকেও বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করে। আমরা যেসব অলৌকিক ঘটন আলোচনা করিয়াছি তাহা পূর্ববর্তী নোটে উল্লিখিত সমুদয় নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রসূল মহানবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের!!
মারহাবা ইয়া হাবীবাল্লাহ!
মারহাবা ইয়া রসূলাল্লাহ!!
মারহাবা, ইয়া মারহাবা, ইয়া মারহাবা।
"ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সারা বিশ্বে অতি বড় এক বিরাট ঘটনা ছিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশ্বজোড়া। প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিস্তারিত ঘটনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, এই প্রতিক্রিয়া নক্ষত্ররাজির উপরও পড়িয়াছিল।* তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, ঊর্ধ্ব জগতের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল; যদ্দরুন সমগ্র জিন জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। জিনদের মধ্যে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৫৯। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫৪৫) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুত্র ছাহাবী আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; যেকোন বিষয়ে তিনি কোন ধারণা অনুমান করিলে আমরা কখনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই।

একদা ওমর (রাঃ) বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট দিয়া একজন সুশ্রী মানুষ পথ অতিক্রম করিল। ওমর (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, আমার ধারণা অবাস্তব না হইলে এই ব্যক্তি অমুসলিম হইবে; আর যদি সে এখন মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে পূর্বে নিশ্চয় গণক-ঠাকুর (জিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এই মন্তব্য করত তিনি লোকটিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, ওমর (রাঃ) তাহার সম্মুখেও ঐ মন্তব্য করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, একজন মুসলমানকে এইরূপে অমুসলিম সন্দেহ করা সঙ্গত কি? অর্থাৎ আমি ত মুসলমান। তখন ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত তুমি পূর্বে কি ছিলে? সে বলিল, আমি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাকে বিজ্ঞাসা করিলেন, যেই জিনটির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় তোমাকে কি জানাইয়াছিল?

ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি বাজারে ছিলাম, অকস্মাৎ সেই জিনটি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, তুমি জান কি? জিনগণ এক ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। (তাহারা দীর্ঘকাল মানুষ জাতিকে নানা প্রকার গর্হিত কার্যে লিপ্ত রাখিয়া স্বৈরাচারিতা চালাইয়া যাইতেছিল, সেই অবস্থা আর তাহারা বিরাজমান রাখিতে পারিবে না বলিয়া) তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্দিনের সূচনা হইয়াছে, ফলে তাহারা নিজেদের সব কিছু গুটাইয়া (সাধারণ লোকালয় হইতে অনাবাদ এলাকার দিকে) দ্রুত পালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রাঃ) ঘটনা শ্রবণান্তে বলিলেন, তোমার জিনটি তোমাকে যে নূতন পরিস্থিতির খবর দিয়াছিল তাহা সত্যই ছিল। আমারও (ইসলাম পূর্বের) তদ্রূপ একটি ঘটনা আছে। একদা আমি মূর্তি ঘরে শুইয়া ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্তিগুলির সম্মুখে একটি গোশাবক বলিদান করিল, তখন বিকট আওয়াজে একটি

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে ঊর্ধ্ব জগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কীয় আলোচনায় দ্রষ্টব্য। নক্ষত্ররাজির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে ৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য। এই ক্ষেত্রে গণক-ঠাকুরের কার্যকলাপ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম টানিয়া আনা– যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা বোখারী শরীফের সহীহ হাদীছকে এনকার করা হইয়াছে– ইহা শুধুমাত্র প্রবঞ্চনার উদ্দেশেই হইতে পারে– যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন।

ঘোষণা শুনিতে পাইলাম– তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সেই ঘোষণাটি ছিল এই– হে জালীহ্ (কাহারও নাম)! একটি সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে– যাঁহার ঘোষণা হইবে, لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্– "আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।" উক্ত আওয়াজে উপস্থিত লোকজন সকলেই ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। (ওমর (রাঃ) বলেন,) তখন আমি মনে মনে এই পণ করিলাম, এই ঘোষণাটির তথ্য সঠিকরূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত আমি ইহার পিছনে লাগিয়া থাকিব। কিছু সময় আমি তথায়ই অপেক্ষা করিলাম এবং পুনরায় ঐরূপ বিকট আওয়াজের সেই ঘোষণাই শুনিলাম– "হে জালীহ! সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার ঘোষণা হইবে–لااله الا الله অতপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরাতে হালাবিয়াহ" নামক কিতাবে অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে–

সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এইরূপই। তিনি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলেন, একটি জিন তাঁহার সংস্রবে ছিল। একদা তিনি রাত্রিবেলা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, তখন ঐ জিনটি আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিল এবং কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িল, যাহার মধ্যে বনী হাশেম গোত্রে এক মহামানবের আবির্ভাবের উল্লেখও ছিল।

প্রথম দিন তিনি ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু পর পর তিন দিন একই রূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কায় উপস্থিত হইয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কতিপয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওয়াদ ইবনে কারেবকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আগমনের মূল ঘটনা আমি জানি। অতপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণায় কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন।

আব্বাস ইবনে মের্দাস (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণে এই ধরনের ঘটনাই বর্ণিত আছে। মাযেন (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

খাতামে নবুয়ত– নবুয়তের মোহর বা ছাপ (পৃষ্ঠা-৫০১)

মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য যেরূপ তাহার Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন থাকে এবং আবশ্যক স্থলে তাহার দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের পরিচয়ের একটি Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন ছিল, তাহাকে খাতামে নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর বলা হয়। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেখানে হযরতের পরিচয়ের উল্লেখ ছিল, তথায় এই মোহরে নবুয়তের উল্লেখ বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণ তাহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। ("প্রথম বহির্দেশ গমন" আলোচনায় বোহায়রা পাদ্রীর ঘটনা এবং "সিরিয়া সফরে হযরত" আলোচনায় নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনা দ্রষ্টব্য।) ঐ শ্রেণীর অনেককে ইসলাম গ্রহণের পূর্বক্ষণেও এই মোহরে নবুয়তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে দেখা যাইত।

ঈসায়ী বা খৃস্টান ধর্মীয় ব্যক্তি সাল্মান ফারেসী (রাঃ)– যাঁহার উল্লেখ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, তিনি শেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ঐতিহাসিক সাধনা করিয়া শেষ পর্যন্ত মদীনায় পৌছিয়াছিলেন। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশে হযরতের পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হযরত (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, সালমান তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিতে চাহিতেছে, তাই হযরত (সঃ) গায়ের চাদর কাঁধের উপর হইতে একটু ছাড়িয়া দিয়া মোহরে নবুয়তের স্থান উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সালমান তাহা দেখামাত্র চুম্বন করত বলিয়া উঠিলেন اشهد انك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (যোরকানী, ১-১৫৪)

মোহরে নবুয়তের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণরূপে বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। তাহা হযরতের পৃষ্ঠে কাঁধদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল, ঠিক মধস্থলে নহে, বরং একটু বাম দিকে, বাম কাঁধের চৌড়া হাড়ের মাথা বরাবর স্থানে ছিল। চামড়ার নীচে ঊর্ধ্বমুখী একটি গুটলির ন্যায় ছিল, পরিমাণে কবুতরের ডিমের ন্যায় কতিপয় লোমে বেষ্টিত ছিল। তাহা হইতে মেশকের সুগন্ধি অনুভূত হইত। তাহার উপর নূর পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম খণ্ডে ১৪২ নং হাদীছ– সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার খালা আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই ভাগিনাটি রুগ্ন। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) আমার মাথার উপর হাত বুলাইলেন আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন এবং অযূ করিলেন; আমি তাঁহার অযূর অবশিষ্ট বা অঙ্গ-ধৌত পানি পান করিলাম। অতপর আমি হযরতের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমি তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিয়াছি; তাহা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিল। পরিমাণে নববধূর জন্য নির্মিত সুসজ্জিত তাঁবুরূপী সামিয়ানার ঘুন্টির ন্যায়।

মোহরে নবুয়তের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আলোচ্য হাদীছে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আরব দেশে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তু ছিল। আমাদের পক্ষে সহজ দৃষ্টান্ত মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে– "কবুতরের ডিমের ন্যায়"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মোহরে নবুয়ত হযরতের জন্মগত ছিল না পরে সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্তেও কাহারও মতে দুধমাতার নিকট থাকাকালে বক্ষ বিদীর্ণ করার সময়, কাহারও মতে নবুয়তের বিকাশকালে, কাহারও মতে মে'রাজ উপলক্ষে। (যোরকানী, -১৬০)

হযরতের নাম (পৃষ্ঠা-৫০০)

নবীজীর নামকরণ সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভকাল ছয় মাস অতিক্রম হইলে একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক আগন্তুক আমাকে বলিতেছে, বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখিবে "মুহাম্মদ"। * আর তুমি এই স্বপ্ন গোপন রাখিও। (যোরকানী, ১-১১১)

দ্বিতীয় বর্ণনা– নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন তাঁহার দাদা খাজা আবদুল মোত্তালেব মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিলেন। সেই উৎসবের দিন আব্দুল মোত্তালেব নবীজীর খাত্‌নার সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার নাম রাখিলেন "মুহাম্মদ"। অনেকের মতে হযরত (সঃ) জন্মগতভাবেই খত্‌নাকৃত ছিলেন। (যাদুল মাআদ)

নামকরণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। "মুহাম্মদ" নামকরণের আসল উৎস বিবি আমেনার স্বপ্ন। নবীজী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বিবি আমেনা খাজা আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার বংশের চেরাগ একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; আপনি আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আবদুল

---

* **সমালোচনা ঃ** "মোস্তফা চরিত" এবং "বিশ্বনবী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের পণ্ডিত লেখকগণ আলোচ্য স্বপ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম "আহমদ" লিখিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন সূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা সীরাত শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ দেখিয়াছি; বিশেষতঃ মোস্তফা চরিতের ফুট নোটে যে, "কামেল" কিতাবের নাম উল্লেখ আছে, তাহারও মূল কিতাব দেখিয়াছি। সর্বত্রই বিবি আমেনার স্বপ্নের আলোচনায় "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য চলিতে পারে না।

মোত্তালেব ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর-সোহাগের সহিত নবজাতক শিশুকে দেখিলেন। তখন বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং নাম সম্পর্কে যে আদেশ পাইয়াছিলেন সব কিছু খুলিয়া বলিলেন। আবদুল মোত্তালেব নবাগত শিশুকে কোলে লইয়া আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে গেলেন এবং দাঁড়াইয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন, শোকরগুজারী করিলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম-১৬০)

সুতরাং আবদুল মোত্তালেব ঐ স্বপ্নের আদেশ নিশ্চয়ই মনে রাখিয়াছেন এবং চিরাচরিত নিয়মানুসারে সপ্তম দিন আনন্দ উৎসরেব মাঝে সে স্বপ্নাদিষ্ট "মুহাম্মদ" নাম আনুষ্ঠানিকরূপেই নির্ধারিত করিয়াছেন। "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৬০। হাদীছ ঃ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوا اللّٰهُ بِى الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি; যথা- আমার নাম "মুহাম্মদ", আমার নাম "আহমদ" এবং আমার নাম "মাহী" তথা মূলোচ্ছেদকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরীর মূলোচ্ছেদ করিবেন এবং আমার নাম "হাশের"- সর্বপ্রথম ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রগামী; ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রসর হওয়া কালীন সমস্ত লোক আমার পদাঙ্কে অগ্রসর হইবে এবং আমার নাম "আকেব"-সর্বশেষে আগমনকারী, (আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" অর্থ অধিক প্রশংসিত; সৃষ্টিকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টনিচয় পর্যন্ত সকলের প্রসংসার পাত্র তিনি; তাই তাঁহার জন্য এই নাম পূর্ব হইতেই বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিল।" "আহমদ" অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী, আল্লাহ তাআলার প্রসংশাকারীদের মধ্যে হযরত (সঃ) অন্যতম একজন হইবেন, তাই তাঁহাকে পূর্ব হইতেই এই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি উক্ত দুই নামে বিশেষত "আহমদ" নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য নাম সমূহের তাৎপর্য মূল হাদীছেই ব্যক্ত হইয়াছে।

১৬৬১। হাদীছ ঃ

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি! আমার শত্রু কাফের কোরায়শরা আমার প্রতি যেসব গালি ও ভৎর্সনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে আল্লাহ তাআলা কিরূপে আমা হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন!

তাহারা "মোজাম্মাম" নাম বলিয়া গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে, অথচ আমি ত "মুহাম্মদ" নামের।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" শব্দের অর্থ অত্যধিক প্রশংসিত। কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গ্লানি করাকালে তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিত না যেই নামের মূলে প্রশংসিত হওয়ার অর্থ রহিয়াছে, "মুহাম্মদ" নামের পরিবর্তে "মোজাম্মাম" শব্দ ব্যবহার করিত, যাহার অর্থ "জঘন্য কলুষিত"।

হযরত (সঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবীদের সম্মুখে করুণাময় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন যে, কি আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে শত্রুর গ্লানি হইতে বাঁচাইয়াছেন। শত্রুর মুখের বাক্য আমার জন্য রক্ষাকবচ হইয়াছে। তাহারা "মোজাম্মাম" নামের ব্যক্তিকে গালি দেয়, আমার ত ঐ নাম নহে, আমার নাম "মুহাম্মদ"।

হযরতের "মুহাম্মদ" নাম আরশের গায়েও লেখা ছিল এবং হযরত মূসার উপর যে তওরাত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল– সেই তওরাত কিতাবেও যেখানে হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং পরিচয় ও গুণাগুণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানেও "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ হইয়াছে।

কা'বে আহ্‌বার ও যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তিনি তওরাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবেই ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কা'ব আহ্‌বার হইতে "মোসনাদে দারেমী" কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ হইয়াছে– কা'বে আহ্‌বার বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল হইবেন, তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় এই এই হইবে।"

বিশেষতঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–

كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ـ

অর্থ ঃ "তওরাত কিতাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ কিরূপ পাইয়াছেন?" কা'বে আহ্‌বার তদুত্তরে বলিয়াছেন–

نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر الى طيبة ـ

অর্থ ঃ "আমরা তওরাতে তাঁহার সম্পর্কে এই পাইয়াছি যে, তাঁহার নাম হইবে "মুহাম্মদ," আবদুল্লাহর পুত্র, মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তায়বা তথা মদীনায় হিজরত করিবেন।"

"মুহাম্মদ" অর্থ চরম প্রশংসিত। সারা বিশ্ব এবং বিশ্বাধিপতি রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রশংসামুখর এবং তিনি সর্বজনীন প্রশংসিত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইবেন, তাই সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্য আদিকাল হইতেই এই মহান নাম নির্বাচিন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর প্রশংসা পবিত্র কোরআনে অনেক রহিয়াছে। যথা–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ـ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থ ঃ "হে বিশ্ববাসী! তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে বিশেষ নূর-আলো বা সত্যের দিশারী তথা রসূল মুহাম্মদ (সঃ) আসিয়াছেন এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব আসিয়াছে। সেই দিশারী এবং কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ তাঁহার সন্তুষ্টির আসক্ত ব্যক্তিকে শান্তির পথে পরিচালিত করিবেন এবং সকল প্রকার অন্ধকার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আলোর দিকে নিয়া আসিবেন নিজ কৃপায় এবং তাহাদিগকে সত্য-সরল পথের দিকে পারিচালিত করিবেন।" (পারা–৬, রুকু–৭)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের নিকট আসিয়াছেন এই রসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত। তোমাদের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের লালায়িত, ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান দয়ালু, (পারা-১১, রুকু-৪)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ۔

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী ও তাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাদের জন্য রসূলুল্লাহ উত্তম আদর্শ।"(পারা-২১; রুকু- ১৯)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "সারা জাহানের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের বাহকরূপে এবং আমার আশীর্বাদরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। -(পারা-১৭, রুকু-৭)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি সত্যের মাপকাঠিরূপে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আল্লাহরই আদেশ মতে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোরূপে।" (পারা-২২, রুকু-৩)।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ ۔

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সত্যের বাহক বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি।"(পারা-২২, রুকু-১৫)

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আপনি আমার রসূলগণের একজন এবং আপনি সত্য-সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।" (পারা-২২, রুকু-১৮)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۔

অর্থ ঃ "শপথ করিয়া বলি, তোমাদের নবী সঠিক-সত্য পথ হইতে চুল মাত্রও বিচ্যুৎ নহেন, ভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই! তিনি প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না; একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত কথাই বলেন" (পারা-২৭, রুকু-৫)

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (পারা-২৯, রুকু-৩)

এতদ্ভিন্ন পূর্বের আসমানী কিতাবেও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর অনেক প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা- প্রতিশ্রুত নবীর জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যে ঘোষণা হইবে তাহার উদ্ধৃতি তওরাতে নিম্নরূপ ছিল-

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের মীমাংসাকারীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে শিক্ষা-দীক্ষাহীন লোকদের জন্য মুক্তির দিশারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত রসূল। আপনার একটি বিশেষ গুণ আমার প্রতি ভরসা স্থাপন; তাহার প্রতীকস্বরূপ আপনার এক নাম 'মোতাওয়াক্কেল' রাখিলাম ('মোতাওয়াক্কেল' অর্থ আল্লাহর উপর ভরসাকারী)।

আমার এই নবী কোমল হৃদয়, বিনীত, ভদ্র-সভ্য ও সৎ সাধু হইবেন– রুষ্ট প্রকৃতির হইবেন না। বাজারে যাইয়াও শালীনতার সহিত কথা বলিবেন– চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। খারাপ ব্যবহারের উত্তর খারাপ ব্যবহার দ্বারা দিবেন না– ক্ষমা করিবেন।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়া হইতে তাঁহার বিদায় মঞ্জুর করিবেন না যাবত না তাঁহার দ্বারা বক্র সম্প্রদায়কে সোজা করেন যে, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তি করে এবং যাবত না এই কালেমার দ্বারা অন্ধ চোখে জ্যোতি সৃষ্টি করেন, বন্ধ কানকে খুলিয়া দেন, আবদ্ধ অন্তকরণ উন্মুক্ত করেন।

(মেশকাত শরীফ, ৫১৬)

১৬৬২। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী আলেম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট কয়েকটি দীনার স্বর্ণমুদ্রা পাইত; সে তাহার তাগাদায় আসিল। নবী (সঃ) বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমার ঋণ পরিশোধের কিছু নাই। ইহুদী বলিল, আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে বসিব; সেমতে হযরত (সঃ) ঐ ইহুদীর সঙ্গেই বসিয়া থাকিলেন, এমনকি জোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায ঐ অবস্থায় পড়িলেন। ছাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইহুদীকে ভয় দেখাইতেছিলেন এবং ধমকাইতে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহা অনুভব করিতে পারিলেন; ছাহাবীগণ (ভাবিলেন, হযরত তাঁহাদের প্রতি রাগ হইবেন, তাই তাঁহারা) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ইহুদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, অমুসলিম প্রজার প্রতিও অন্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

পর দিন এই অবস্থায় অনেক বেলা হইলে ইহুদী ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমার অর্ধেক ধন-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করিলাম। সে আরও বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা আপনার যে প্রশংসা তওরাত কিতাবে করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যে– "তিনি মুহাম্মদ– পিতা আবদুল্লাহ, তাঁহার জন্মস্থান মক্কায়, হিজরতের দেশ "তায়বা" তাঁহার রাজ্য অচিরেই সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছিবে, তিনি কঠোর প্রকৃতির রুক্ষ মেজাজের হইবেন না। (ভদ্র ও সভ্য-শালীন হইবেন যে,) বাজারেও চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। অশ্লীল আচার-ব্যবহার ও অশ্লীল কথা হইতে পাক-পবিত্র হইবেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় স্বীকৃতি ঘোষণা করিল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। ঐ ইহুদী বড় ধনাঢ্য ছিল; তাহার সমুদয় মাল হযরতের অধীনে দিয়া দিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসার চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন যখন তিনি স্বয়ং তাঁহারই সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে স্বীয় "হাবীব" বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পী যখন কোন একটি বিশেষ বস্তুকে তাঁহার পছন্দনীয় সমুদয় গুণ-গরিমা মাধুরী-সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে গড়েন এবং তাহা তাঁহার মনমত ও মনপূত হয় তখনই তিনি তাঁহার হাতে গড়া বস্তুটিকে ভালবাসেন, তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আসক্তি জন্মে। সুতরাং কোন শিল্প বস্তুর প্রতি স্বয়ং শিল্পীর ভালবাসা আকর্ষণ শিল্পী কর্তৃক উক্ত বস্তুর চরম প্রশংসা এবং সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের মহা সনদই বটে।

বিশ্ব শিল্পী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এমন এবং এতই ভালবাসিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "হাবীবুল্লাহ"– আল্লাহ তাআলার বন্ধু বা দোস্ত আখ্যা দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ ..... وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি তথ্য প্রকাশ করিতেছি– গর্ব করার উদ্দেশে নহে, ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন, আর আমি "হাবীবুল্লাহ" অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ আমার সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন– আমাকে দোস্ত বানাইয়াছেন।"

মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়াছেন– চরম ভালবাসা দিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার আকার-আকৃতি তথা অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বন করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকেও ভালবাসিবেন। এই তথ্য স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়াছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার প্রিয়নবী! আপনি বিশ্ববাসীকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ-অনুকরণ কর, তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (পারা–৩, রুকু–১২) এই আয়াতের মর্ম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলার চরম ভালবাসার পাত্র হওয়ার এক উজ্জ্বল প্রমাপ; আর ইহাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ার মহা সনদ।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বনে যে কেহ ধন্য হইতে পারিবে সে-ই আল্লাহ তাআলার ভালবাসার পাত্র হইবে, অতএব স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) যে আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র তাহা পরিমাণ করা যাইতে পারিবে কি? আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক এইরূপ ভালবাসা দান তাঁহার চরম প্রশংসা।

আল্লাহ তাআলা আদর-সাহাগ করিয়া নিজের 'মাহমুদ' নামের ধাতু হইতে 'মোহাম্মদ' নাম বাহির করিয়াছেন। এস্থলে আদর-সোহাগের কি বিচিত্র এবং সীমাহীন বিকাশ যে, 'মাহমুদ' অর্থ প্রশংসিত এবং 'মুহাম্মদ' অর্থ চরম প্রশংসিত।

এই তথ্যটি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী– বিশিষ্ট কবি হাস্সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন–

وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ ـ فَذُوْ الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থঃ আল্লাহ (আদর-সোহাগ করিয়া) নিজের নাম হইতে তাঁহার নাম বাহির করিয়াছেন, অধিকন্তু মহান আরশের অধিপতি (আল্লাহ) হইয়াছেন 'মাহমুদ' নামের (যাহার অর্থ প্রশংসিত) এবং হযরতের নাম হইল 'মুহাম্মদ' (যাহার অর্থ চরম প্রশংসিত)।*

হযরতের দ্বিতীয় অন্যতম নাম 'আহমদ'। ইঞ্জীল কিতাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে তিনি এই নামেই অধিক ব্যক্ত হইয়াছেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ঘোষণা দিয়া থাকিতেন, "আমার পরে এক নবী আসিতেছেন, তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"

'আহমদ' অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী তিনি হইবেন, তাই আদি হইতেই তাঁহাকে 'আহমদ' নামে ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই দুইটি প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া হযরতের আরও গুণবাচক অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে তিনটি নামের উল্লেখ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাৎপর্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের আরও অনেক নাম প্রচলিত আছে, যথা– 'মোতাওয়াক্কেল', অর্থ আল্লাহর প্রতি ভরসা স্থাপনকারী। আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা স্থাপনের গুণটি নবীজী (সঃ)-এর

* আদর-সোহাগভরা 'মুহাম্মদ' নামের বিশ্লেষণে কবি হাস্সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লিখিত উক্তিও আল্লাহ তাআলার নিকট অতি মকবুল ও পছন্দনীয় হইয়াছে। এমনকি এক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলিয়াছেন, উল্লিখিত বয়াতটির নিম্নের আঙ্গিক নক্শা একটি কাগজ খণ্ডে লিখিয়া সন্তান প্রসবকালীন বিপদগ্রস্ত প্রসূতির গলায় লটকাইয়া দিলে তাহার উপর আল্লাহর রহমত নামিয়া আসিবে এবং সহজ-সরলভাবে সন্তান প্রসব করিবে।

নক্‌শাটি এই –

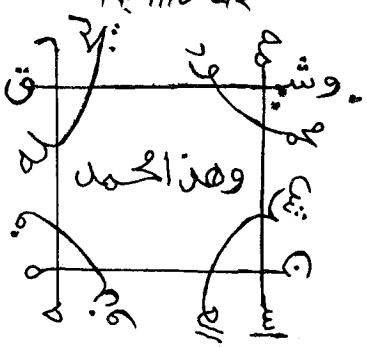

মধ্যে যে পরিমাণ ছিল তাহার পরিমাপও অন্যের জন্য সম্ভব নহে। একটি ঘটনাদৃষ্টে সামান্য অনুমান করা যায় মাত্র। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের সফরে নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-সহ 'সওর' পর্বত গুহায় লুক্কায়িত আছেন; মক্কার রক্ত-পিপাসু শত্রু দল তাঁহাদেরকে খোঁজ করিতে করিতে ঠিক সেই গুহার কিনারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনকি গুহার ভিতরস্থ আবু বকরের দৃষ্টিতে ঐ শত্রু দলের পা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজ পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। সেই মুহূর্তেও নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, لا تحزن ان الله معنا- '"বিচলিত হইও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (কোরআন শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর এই নামটি (অর্থাৎ মোতাওয়াক্কেল) পূর্বের আসমানী কিতাব তওরাতেও উল্লেখ ছিল।

"আমীন" অর্থ শান্তিকামী, বিশ্বস্ত। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট সকলের নিকটই তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন। 'বশীর' অর্থ মুমিনদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দানকারী, 'নাজীর' আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ককারী। 'আবদুল্লাহ'– আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা, পবিত্র কোরআনে সূরা জিন-এর মধ্যে এই নামটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদিত হওয়া নবীজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সাইয়্যেদ' অর্থ সর্দার বা প্রধান, নবীজী নিখিল সৃষ্টির প্রধান, নবী ও রসূলগণের প্রধান। 'মোকাফ্‌ফা' অর্থ সর্বশেষে প্রেরিত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন। 'নবীউত্ তওবা' অর্থ তওবার নবী; নবীজী (সঃ) গোনাহমুক্ত হইয়াও তওবা করা অতি ভালবাসিতেন। হযরত (সঃ) বলিতেন, হে লোকসকল! তোমরা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে তওবা করিও; আমিও প্রতিদিন একশত বার তওবা করিয়া থাকি। নবীজী (সঃ)-এর সম্মানে তাঁহার উম্মতের তওবা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় অধিক শীঘ্র ও সহজে কবুল হইয়া থাকে। 'নবীউল মাল্‌হামাহ' অর্থ জেহাদী নবী। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মতের ন্যায় এত অধিক জেহাদ আর কোন নবী এবং তাঁহার উম্মতের দ্বারা হয় নাই। 'সিরাজুম মুনীর' অর্থ দীপ্ত সূর্য; কুফরী, শেরেকী ও গোমরাহীর অন্ধকার দূরীকরণে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীপ্ত সূর্য অপেক্ষা অধিক ভাস্কর ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহর গুণবাচক নাম হইতে কোন কোন নাম নবীজীর জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা--- 'রউফ' অর্থ অতিশয় স্নেহশীল, 'রহীম' অর্থ অতিশয় দয়ালু।

হযরতের উপনাম (পৃষ্ঠা-৫১০)

১৬৬৩ । হাদীছ ঃ عَنْ اَنَس رضى الله تعالى عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِىْ السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْه النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ (لَمْ اَعْنِكَ) اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ -

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাজারে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম'! বলিয়া (কোন ব্যক্তিকে) ডাকিল। হযরত নবী (সঃ) (যেহেতু আবুল কাসেম নামে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি) পেছন দিকে তাকাইলেন। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ত (আবুল কাসেম বলিয়া) আপনাকে উদ্দেশ করি নাই; আমি ঐ (অপর) ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি! তখন হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার আসল নামের অনুকরণে নাম রাখিতে পারিবে, কিন্তু আমার যে উপনাম আছে অন্য কেহ সেই উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِيْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আসল নামের অনুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনামের অনুকরণে উপনাম অবলম্বন করিও না। কারণ, (আমার উপনাম 'আবুল কাসেম'– যাহার অর্থ অতি বেশী বণ্টনকারী– আল্লাহ তাআলার কল্যাণ ও মঙ্গল ভাণ্ডার) আমি তোমাদের মধ্যে সদা বণ্টন করিয়া থাকি। (পৃষ্ঠা–৯১৫)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ উপনাম ছিল 'আবুল কাসেম' যাহার শব্দার্থ– বণ্টনকারীর পিতা। এই উপনামের একটি সাধারণ সূত্র এই ছিল যে, হযরতের বড় ছেলের নাম 'কাসেম' ছিল, অতএব তিনি আবুল কাসেম– কাসেমের পিতা ছিলেন। এই সূত্রেই ইহুদী-নাসারারা হযরত (সঃ) কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিত।

কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার এই উপনাম শুধু শাব্দিক অর্থ– কাসেমের পিতা হওয়া সূত্রেই ছিল না বরং এই উপনামের মধ্যে হযরতের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুণের প্রকাশও ছিল। 'আবুল কাসেম' অর্থ সদা বিতরণকারী; দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের যে ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন তাহা তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সদা বণ্টন করিয়া থাকিতেন, যদ্বারা তিনি رحمة للعلمين রাহ্‌মাতুল-লিল আ'লামীন তথা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত বা কল্যাণ মঙ্গলের উৎস ছিলেন। এমনকি এই গুণ তাঁহার একটি বিশেষ নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাহ্‌মাতুল-লিল আলামীন গুণ বা নামের একটি বিশেষ অধ্যায় 'আবুল কাসেম' উপনামে ব্যক্ত হইয়াছে।

হযরত (সঃ) তাঁহার নামের অনুকরণে নাম রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপনাম অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে, যাহার আসল কারণ এই যে, অনেকে বিশেষতঃ ইহুদী-নাসারাগণ এবং তাহাদের দেখাদেখি নবাগত লোকগণ সাধারণতঃ হযরত (সঃ)-কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিত। এমতাবস্থায় যদি অন্য কাহারও এই নাম থাকে, তবে যখন তাহাকে সম্বোধন করা হইবে তখন স্থানবিশেষে অযথা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে এবং তিনি বিব্রত হইবেন; তাই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল, কিন্তু মদীনায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হযরতকে সাধারণতঃ তাঁহার আসল নামে কেহ সম্বোধন করিত না, তাই ঐ নামে সম্বোধনের বেলায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং ঐ নামের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। এই সূত্রেই অধিকাংশ আলেমের মতে 'আবুল কাসেম' নাম অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা হযরতের জীবৎকাল পর্যন্ত বলবত ছিল, তাঁহার পরে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে।

হযরতের দুগ্ধপান

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত (সঃ) সাত বা নয় দিন স্বীয় মাতা বিবি আমেনার দুগ্ধপান করিয়াছেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী 'সুওয়াইবা' মাত্র কতিপয় দিন দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন; স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় ইহা

অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল মাত্র। ইতিমধ্যে আরবের প্রথানুযায়ী সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী রমণীদের একটি দল মক্কায় পৌঁছিল; তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন। বিবি হালিমার নিজ বর্ণনা–

আমি আমার সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী মহিলাদের সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কাপানে যাত্রা করিলাম। এই বৎসর আমাদের অঞ্চলে অভাব ছিল; অনাহারে আমার দুগ্ধ খুবই কম হইয়া গিয়াছিল। আমার নিজের যে একটি পুত্র সন্তান ছিল তাহার জন্যই আমার দুধ যথেষ্ট হইত না; ক্ষুধায় সে কাঁদিত; তাহার কান্নায় আমাদের নিদ্রাও পূর্ণ হইত না। আমাদের একটি উট ছিল, ঘাসের অভাবে তাহার দুধ ছিল না। এতদসত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় আমাকে ধাত্রী ব্যবসায় নামিতে হইল। আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়াছিলাম, গাধাটিও ক্ষীণ ও দুর্বল ছিল; সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিত না; বহু কষ্টে মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইলাম।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এতীম শুনিয়াধাত্রী মহিলারা কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এদিকে বিবি হালিমার দুধ কম দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিল না। হালিমার দুগ্ধ কম হওয়াই তাঁহার সৌভাগ্য নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণ হইল।

হালিমার বর্ণনা– আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, খালি হাতে বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা ঐ এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাহাই হইল; সেমতে আমি এতীম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে আমার অবস্থানে নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিয়া বরকত-মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল। তিনি এবং আমার ছেলে উভয়েই পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া দুধ পান করিল। আমাদের সঙ্গে যে শুষ্ক দুর্বল উটটি ছিল উহাকেও দেখিলাম, উহার কুচ দুধে ভরিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী দুধ দোহাইয়া আনিলেন; আমরা সকলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ আমরা দীর্ঘ দিন পর রাত্রে শান্তির নিদ্রা উপভোগ করিলাম। এখন আমার স্বামীও বলিতে লাগিলেন, শিশুটি ত অত্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় দেখা যাইতেছে!

আমরা শিশুকে লইয়া মক্কা হইতে যাত্রা করিলাম; এইবার আমার বাহন গাধাটি এত দ্রুতগামী হইয়া গেল যে, সঙ্গীদের কাহারও বাহন তাহার সঙ্গে চলিতে সক্ষম নহে। এমনকি এই অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহা কি তোমার পূর্বের বাহনটি?

আমরা ঐ শিশুকে লইয়া গৃহে পৌঁছিলাম; দেশে তখন ভয়াবহ অনাবৃষ্টি এবং অভাব ছিল; পশুর দুগ্ধ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমি বাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বকরীগুলি দুধে পূর্ণ হইয়া গেল; প্রতিদিন আমার বকরী দল মাঠ হইতে দুধে পরিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে; অন্যদের বকরীতে মোটেই দুধ হয় না। দেশীয় লোকগণ তাহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিত, হালিমার বকরী দল যথায় চরে, আমাদের পশুপালও তথায়ই চরাইও। কিন্তু একই স্থানে চরা সত্ত্বেও অবস্থা এইরূপই হইত। দুগ্ধ পানের দু'টি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমরা এইরূপ বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণ সর্বদাই উপভোগ করিয়াছি। (সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া– ২৭)

দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ নিয়মানুসারে বালক মুহাম্মদ (সঃ)-কে লইয়া আমি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শিশুর বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণদৃষ্টে আমার মন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি ছিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময় মক্কায় প্লেগের মহামারী ছিল; আমার একটু সুযোগ হইল; আমি বিবি আমেনাকে বুঝাইলাম, এখন শিশুকে মক্কায় রাখা ভাল হইবে না; তিনি শিশুকে আমার নিকট রাখিতে সম্মত হইলে পুনরায় তাঁহাকে লইয়া আমার দেশে পৌঁছিলাম।

একদা বালক মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার দুধ ভাইয়ের সঙ্গে গৃহের নিকটেই পশুপালের রাখালীতে ছিলেন; হঠাৎ দুধভ্রাতা দৌড়িয়া আসিল এবং আমার ও তাহার পিতার নিকট বলিল, আমার কোরায়শী ভাইকে সাদা পোশাকে পরিহিত দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী করিয়া তাহার পেট ফাঁড়িয়া ফেলিয়াছে; আমি তাহাকে এই অবস্থায়ই রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

এই সংবাদে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দৌড়াইয়া ছুটিলাম; আমরা যাইয়া দেখি বালক মুহাম্মদ (সঃ) ভীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ঘটনা? তিনি বলিলেন, সাদা পোশাকের দুই ব্যক্তি আমাকে শায়িত করিয়া আমার বক্ষ চিরিয়াছে এবং কি যেন তালাশ করিয়া বাহির করিয়াছে– আমি তাহা পূর্ণ জ্ঞাত নহি। আমরা তাঁহাকে বাড়ী নিয়া আসিলাম। স্বামী আমাকে বলিলেন, হালিমা! মনে হয় বালকটির উপর জিনের আছর হইয়াছে; খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস। সেমতে আমি বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছিলাম।

বিবি আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত অনুরোধ করিয়া পুনঃ নেওয়ার পর নিজেই ফিরাইয়া আনিলে কেন? আমি বলিলাম, এখন বুঝ-জ্ঞানের হইয়াছে, আমারও যাহা করার করিয়াছি, তাই এখন নিয়া আসিয়াছি। বিবি আমেনা বলিলেন, ব্যাপার ইহা নহে; সত্য বল। তখন আমি সব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। বিবি আমেনা বলিলেন, তোমার আশঙ্কা– তাঁহার উপর ভূতের আছর হইয়াছে! খোদার কসম– এই ছেলের উপর কস্মিনকালেও তাহা হইতে পারে না। আমার ছেলের অনেক অবস্থাই অসাধারণ, এই বলিয়া বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়াকালের অনেক ঘটনা শুনাইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছিল "শাক্কে সদর" বা বক্ষ বিদারণ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ এক বিশেষ শিরোনামায় বর্ণিত হইবে। ইহা হযরতের এক বিশেষ মোজেযা। এইবারের বক্ষ বিদারণই হযরতের সর্বপ্রথম 'শাক্কে সদর' ছিল; এই সময় হযরতের বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইহা ঘটিয়াছিল কাহারও মতে তৃতীয় বৎসরে, কাহারও মতে চতুর্থ বৎসরে, কাহারও মতে পঞ্চম বৎসরে। তবে ইহা সর্বসম্মত যে, এই ঘটনা বিবি হালিমার নিকট থাকাবস্থায় ঘটিয়াছিল এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে তাঁহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন– (যোরকানী, ১–১৫০)।

এই সম্পর্কে হাদীছও আছে ঃ

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বাল্যাবস্থায় বালকদের সহিত খেলায় ছিলেন; এমতাবস্থায় জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলেন। অতপর হৃৎপিণ্ড (কাটিয়া তাহা) হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আপনার দেহের মধ্যে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ঐ হৃৎপিণ্ডকে স্বর্ণের তশতরিতে রাখিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর কাটা হৃৎপিণ্ডটি জোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং যথাস্থানে তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া দিলেন।

এই সময় বালকগণ দৌড়াইয়া নবীজীর দুধ মাতার নিকট আসিয়া বলিল মুহাম্মদকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহারা সকলে বালক নবীজীর নিকট পৌঁছিল; তখন নবীজীর চেহারা বিবর্ণ ছিল। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর বক্ষে আমি সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিতাম। (মুসলিম শরীফ, মেরাজ বর্ণার সংলগ্নে)

উক্ত ঘটনা যে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে নবীজীর বাল্যাবস্থা ছিল, দ্বিতীয় প্যারায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।*

---

* **সমালোচনা ঃ** সীরাত সঙ্কলনে কলম ধরিলেই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আলোচনা আসে। কারণ, নবীগণের ব্যক্তিত্ব ছিল অতি অসাধারণ; নবীগণের নবী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা ত আরও একধাপ উর্ধ্বে। আর আল্লাহ তাআলার কুদরত ত অসীম। কিন্তু কোন অস্বাভাবিক ঘটনার আলোচনা আসিলেই নিশেষ বাতিক-ব্যাধিগ্রস্ত মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের কথা মনে আসে যে, মোস্তফা চরিতে এই সম্পর্কে নিশ্চয় গোলমাল করা হইয়া থাকিবে।

ইসলামের দুই ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ; সুন্নাহ তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই কিতাব– বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর 'শাক্কে সদর' বা বক্ষ বিদারণ মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ত বোখারী শরীফেও রহিয়াছে, আর আলোচ্য ঘটনার বর্ণনা মুসলিম শরীফে রহিয়াছে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে রাখা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরতের প্রথম দুধমাতা সুওয়াইবা হযরতের চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হইলে সুওয়াইবা দৌড়িয়া যাইয়া আবু লাহাবকে ভাতিজা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন। আবু লাহাব আনন্দিত হইয়া এই সুসংবাদ দাতের পুরস্কার স্বরূপ তৎক্ষণাত সুওয়াইবাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবু লাহাব তখন হযরতের বাস্তব পরিচয়ের কোন খোঁজ রাখিত না এবং সে ছিল কাফের, তবুও হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আনন্দিত হইয়া যে শ্রদ্ধা দেখাইল তাহার অতি বড় সুফলের অধিকারী সে চিরকালের জন্য হইয়া রহিয়াছে।

বর্ণিত আছে, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর হযরতের অপর চাচা আব্বাস তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু লাহাব বলিল, দোযখের শাস্তি ভোগ করিতেছি, অবশ্য প্রতি সোমবার রাত্রে আমার দুইটি আঙ্গুলের মধ্য হইতে একটু পানীয় পাইয়া থাকি যাহাতে আমার কষ্টের অনেক লাঘব ঘটে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ দানের উপর সুওয়াইবাকে এই আঙ্গুলদ্বয়ের ইশারায় মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম; তাহারই সুফল ও প্রতিদানে আমি ইহা লাভ করিয়া থাকি (যোরকানী, ১-১৩৮)। মূল ঘটনাটির বর্ণনা বোখারী শরীফ ৭৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মোস্তফা চরিতে এই বিবরণটার উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলা হইয়াছে-"যাহা হউক, বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশতাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।" (পৃষ্ঠ-২০৩)

পাঠক! মুসলিম শরীফের উল্লিখিত হাদীছটির মূল বর্ণনাকারী হইলেন "ছাহাবী আনাছ (রাঃ)।" যিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল দিবা-রাত্র, ভ্রমণে-অবস্থানে সর্বদা নবীজী মোস্তফার সেকবরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছেন। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "সাবেত বুনানী (রাঃ)", যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহচর্যে থাকিয়াছেন। বসরা এলাকার সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র ২৭ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী 'হাম্মাদ ইবনে সালামা (রঃ)" তিনি বসরা এলাকার বিশিষ্ট আলেম দেশ-বরেণ্য মোহাদ্দেস ছিলেন, অত্যধিক এবাদত-বন্দেগী ও সুন্নতের তাবেদারীতে তিনি অদ্বিতীয়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, নবীজীর শতাব্দীতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলে ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ) ইত্যাদি বড় বড় মোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ 'শায়বান (রঃ)'; আর তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,ইমাম মুসলিম (রঃ)।

দেখা গেল- আলোচ্য হাদীছখানা প্রসিদ্ধ সহীহ মুসলিম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে চারি জন অতি মহান লোকের সাক্ষ্য সূত্রে এবং পঞ্চম জনই হইলেন ইমাম মুসলিম (রঃ)। আনাছ (রাঃ) সাবেত বুনানী (রঃ), হাম্মাদ (রঃ) শায়বান (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ)- এই পবিত্রাত্মা মহান লোকগণকে "আমাদের কথকগণ" বলিয়া কটাক্ষ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাহাদের বর্ণিত হাদীছকে "তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই" বলা, সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীছকে 'গল্প' বলা, "তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই" বলা- এইসব ধৃষ্ঠতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে "মোস্তফা-চরিত" বিপরীত নামীয় সঙ্কলনের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলে এবং এই শ্রেণীর কটূক্তিকারকের মুখে থুথু দিলে তাহা অসঙ্গত হইবে কি?

আলোচ্য ঐতিহাসিক সত্যটি অস্বীকার করার জন্য মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করা হইয়াছে এবং যেসব মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা আরও আশ্চর্যজনক এবং জঘন্য। যথা- বোখারী শরীফসহ সমস্ত হাদীছের কিতাবে বর্ণিত মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে নবীজীর ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ ঘটনার বর্ণনা এবং বিবি হালিমার গৃহে ৪ বৎসর বয়সের ঐরূপ ঘটনার বর্ণনা এত অধিক ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ঘটনাকে আকার-আকৃতির সামঞ্জস্যের কারণে এক ঘটনা গণ্য করিয়া শুধু বর্ণনার গরমিল ঠাওরানো- যেরূপ মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মে'রাজ সংক্রান্ত বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।" (পৃষ্ঠা-২০৩)- এই উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়!

অপর দিকে গরমিলের কাহিনী ত আরও হাস্যকর। তিনটি ঘটনা- (১) বিবি হালিমার গৃহে বাল্যকালে ৪ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ, (২) নবুয়তপ্রাপ্তির পর মে'রাজ উপলক্ষে ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ (উভয় ঘটনা জাগ্রত অবস্থায়), আর (৩) অনুমান ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বাস্তব ও মূল মে'রাজ ঘটনার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ মে'রাজ আলোচনায় আসিবে । এই ঘটনাটি স্বপ্নযোগের এবং মুল মে'রাজের ঘটনার অবিকল প্রদর্শনী ছিল, সুতরাং মূল মেরাজ উপলক্ষে বাস্তব বক্ষ বিদারণের আকৃতিতে স্বপ্নে তাহার প্রদর্শনী ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ঘটনা বিভিন্ন ছাহাবীর সহিত আনাছ (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই জন্য তিনটি ঘটনা একসঙ্গে গোঁজামিল দিয়া একটির বর্ণনা দ্বারা অপরটির বর্ণনা মিথা বলা- যেমন মোস্তফা চরিতে দ্বিতীয় বর্ণনা দেখাইয়া প্রথম বিবরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "আবু জর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।" (পৃষ্ঠা-২০১) তদ্রূপ বর্ণনাটি সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে

হযরত (সঃ) পরবর্তীকালে মাত্র অল্প দিনের এই দুধমাতা সুওয়াইবার প্রতিও অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার পরও হযরত (সঃ) স্বয়ং সুওয়াইবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। মদীনায় হযরত (সঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসার পরও তিনি সুওয়াইবার জন্য মদীনা হইতে নানা প্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকিতেন। মক্কা জয় করিয়া হযরত (সঃ) তথাকার সর্বেসর্বা হইয়া 'সুওয়াইবা' এবং তাঁহার পুত্র 'মসরূহ্' সম্পর্কে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা বাঁচিয়া নাই। তখন হযরত (সঃ) সুওয়াইবার অন্য আত্মীয়বর্গের খোঁজ করিলেন তাহাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইবার জন্য, কিন্তু তাহাদেরও কেহ বাঁচিয়া ছিল না।

কোন কোন আলেমের মত এই যে, সুওয়াইবা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(সীরাতে মোস্তফা, ১–৫৩)

হযরতের স্থায়ী দাই মাতা ছিলেন বিবি হালিমা; তিনি ছিলেন 'বনু সা'দ' গোত্রের। বনু সা'দ গোত্র সমগ্র আরবের মধ্যে আরবী ভাষার লালিত্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুললিত এবং মার্জিত ছিল। আল্লাহ তাআলার কুদরতে নবীজীর শৈশব সেই বনু-সা'দ গোত্রেই কাটিল; হযরতের ভাষা উন্নত মানের

অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় বক্ষ বিদারণ ব্যাপারটি.... একেবারে মাঠে মারা যাইবে।" (পৃষ্ঠ–১৯৮) এইসব প্রলাপোক্তিকারীকে কি বলা যায়?

আর একটি অজ্ঞতার কথা এই বলা হইয়াছে যে, "আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই।" (পৃষ্ঠা–২০১) এই কথাটা সত্য হইলেও হাদীছ শাস্ত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। মূল্য হইত যদি আনাছ (রাঃ) ছাহাবী না হইতেন। কোন ছাহাবী এই শ্রেণীর কোন কথা বর্ণনা করিলে তাহা সর্বসম্মতরূপে গৃহীত। কারণ, ছাহাবী নিশ্চয় স্বয়ং হযরতের বর্ণনা বা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন মানিতে হইবে। অন্যথায় ছাহাবীকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। ইহা হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বিধান, কিন্তু অজ্ঞতার কোন ঔষধ নাই।

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে একটি বিষয় এই আছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহা হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আপনার দেহে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা।" এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তিরূপে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা শুধু প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

একটি মানবীয় দেহে সকল প্রকার অংশই থাকিবে। ইহাতে নখ থাকিবে; চুল থাকিবে, এমনকি অবাঞ্ছিত লোমও থাকিবে ,যাহা কটিয়া ফেলিতে হয়; মল-মূত্রের উদ্রেককারী নাড়ি-ভূঁড়িও থাকিবে। তদ্রূপ মানব যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার সম্মুখীন জীব এবং পরীক্ষা হইবে শয়তান দ্বারা। ইচ্ছা করিলে শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিতে পারে, এই ক্ষমতার উৎসও মানবীয় দেহে থাকিবে, নতুবা পরীক্ষা হইতে পারে না; ফেরেশতা পরীক্ষার সম্মুখীন জীব নহে, তাই তাহার দেহে এই উৎস নাই।

নবীজীর এই নশ্বর দেহ মানবীয় দেহই বটে। সুতরাং মানবীয় দেহের নিয়মিত সমুদয় অংশই ইহাতে থাকিবে; যাহা অপসারণের তাহা অপসারিত হইবে। যেমন, মল-মূত্র, নখ, অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি। এইসব অবশ্যই অপসারণের বস্তু, তাই বলিয়া এইসব মানবীয় দেহে থাকিবে না– আল্লাহর সৃষ্টির বিধান এরূপ নহে। তদ্রূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উৎস, যাহাকে এই হাদীছে "শয়তানের অংশ" বলা হইয়াছে, তাহাও অন্যান্য মানব দেহের ন্যায় নিয়মিতরূপে নবীজীর এই নশ্বর দেহেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অবশ্য নবীজীর বৈশেষ্ট্য এই যে, তাঁহাকে মা'সুম বে-গোনাহ রাখার জন্য অবাঞ্ছিত বস্তুর ন্যায় ঐ অংশকে তাঁহার দেহ হইতে বাল্যকালেই অপসারণ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য দ্বারা নবীজীর মান-মর্যাদা বাড়ে বৈ কমে না বা ক্ষুণ্ন হয় না।

সুতরাং "উক্ত তথ্য মতে স্বীকার করিতে হইবে যে, শয়তানের অংশ তাঁহার (নবীজীর দেহের) মধ্যে বলবত ছিল"– এই ভয় দেখাইয়া তারপর নবীজীর (সঃ) প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার ফাঁদ তৈয়ার করা প্রবঞ্চনা বৈ নহে।

চারি বৎসর বয়সে– বাল্য অবস্থায় নবীজীর (সঃ) নশ্বর দেহের মধ্যে অবাঞ্ছিত অংশের ন্যায় শয়তানের অংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিলে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব দেখা দিবে– এই মায়াকান্না আর একটা অজ্ঞতা। এক হাদীছে আছে, একদা রসূল (সঃ) বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা সাথী এবং এক জন জীন জাতিয় (শয়তান) সাথী থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্যও আছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার জন্যও আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে ঐ জিন জাতীয় সাথী শয়তানের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; ফলে সে আমার বাধ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অনিষ্ট হইতে আমি বাঁচিয়া আছি, সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে না। (মেশকাত শরীফ ১৮)। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কারণ ইহাও একটি ছিল। স্বয়ং হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদক্ষ ও লালিত্যের অধিকারী; এর (বাহ্যিক) কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরায়েশ বংশে এবং প্রতিপালন হইয়াছ বনু সা'দ গোত্রে। (সীরাত ইবনে হেশাম–১৬৭)

বিবি হালিমার স্বামী, হযরতের দুধ-পিতার নাম ছিল "হারেস"। বিবি হালিমার এক পুত্র ছিল, যে হযরতের সঙ্গে দুগ্ধপান করিয়াছে; নাম ছিল আবদুল্লাহ। দুই মেয়ে ছিল– এক মেয়ের নাম "ওনায়সা" অপর মেয়ের আসল নাম হোযায়ফা (উচ্চারণে মতভেদ আছে); তাঁহারই ডাকনাম ছিল "শায়মা" এবং এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। তিনি সকলের বড় ছিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার– ৫১) নবীজীর লালন-পালনে তাঁহার বহু দান ছিল; তিনি হযরতের অনেক সেবা করিতেন এবং হযরতকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। শায়মা শিশু নবীজীকে দোলা দিত এবং কোলে নিয়া নাচনা ও গীত গাহিত–

هٰذَا اَخٌ لَمْ تَلِدْهُ اُمِّیْ ۔ وَلَیْسَ مِنْ نَسْلِ اَبِیْ وَعَمِّیْ
فَدَیْتُهٗ مِنْ مَخُوْلٍ مُعْمِیْ ۔ فَانْمِهِ اَللّٰهُمَّ فِیْمَا تُنْمِیْ ۔

"এইটি আমার ভাই– আমার মাতার নয়
আমি তাকে ভালবাসি– আমার পিতার নয়
কোরবান করি মামা-চাচা সবই তাঁহার শানে
খোদা! তাঁহায় বাড়াও তুমি সর্ব গুণে-মানে।"

নাচনার তালে শায়মা আরও বলিত–

یَارَبَّنَا اَبْقِ اَخِیْ مُحَمَّدًا ۔ حَتّٰی اَرَاهُ یَافِعًا وَّاَمْرَدًا
ثُمَّ اَرَاهُ سَیِّدًا مُّسَوَّدًا ۔ وَاَکْبِتْ اَعَادِیَهٗ مَعًا وَالْحُسَّدَا
وَاَعْطِهٖ عِزًّا یَّدُوْمُ اَبَدًا

এই হাদীছের তথ্য অনুযায়ী বক্ষ বিদারণ হাদীছের তথ্যকে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার বিরোধী বলা প্রবঞ্চনা ছাড়া কি বলা যায়? আরও অধিক প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, বক্ষ বিদারণ হাদীছকে সত্য বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, "হযরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'সূম ছিলেন না। (পৃষ্ঠা–১৯৯) কত বড় অজ্ঞতা! "মা'সুম" অর্থ গোনাহ হইতে সুরক্ষিত, অর্থাৎ নবীজীর দ্বারা গোনাহের অনুষ্ঠান হইবে না। ইহার জন্য গোনাহের উৎস সৃষ্টিগতভাবে, তাহাও অতি বাল্যকালে শুধু দেহে বিদ্যমান থাকা ক্ষতিকর নহে, বরং বাল্যকালেই ঐ উৎসের অপসারণের দ্বারা মা'সুম হওয়ার গুণ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং ঐ তথ্য হযরতের মা'সুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং ইহা প্রমাণকারী। যেরূপ শয়তান সঙ্গী হওয়ার হাদীছ মা'সুম হওয়ার পরিন্থী নহে, বরং আল্লাহ তাআলার সাহায্যে ঐ শয়তান বাধ্যগত হইয়া গিয়াছে বলায় ঐ হাদীছ মা'সুম হওয়ার প্রমাণ গণ্য হইবে।

একাধিকবার বক্ষ বিদারণ, বিশেষতঃ বোখারী শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রমাণিত মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে যে, "হযরত নবুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও তাঁহার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল। (পৃষ্ঠা–১৯৯) নাউযুবিল্লাহ! কিরূপ শয়তানী কথা! এই শ্রেণীর অপদার্থ মার্কা বেআদবের বে-ঈমানী উক্তির আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কি আশ্চর্য প্রবঞ্চনা করায় বেঈমানীর উক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বিভিন্ন হাদীছে হযরতের একাধিকবার বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শয়তানের অংশ অপসারণ করার তথ্য শুধুমাত্র বাল্যকালের বক্ষ বিদারণের বেলায় উল্লেখ রহিয়াছে; অন্য কোন উপলক্ষের বক্ষ বিদারণে তাহার উল্লেখ নাই। পূর্বাপর সকল ইমামও এক এক বারের বক্ষ বিদারণের হেকমত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। যথা– বাল্যকালের বক্ষবিদারণে নশ্বর দেহ হইতে শয়তানের অংশ অপসারণ করা হইয়াছে, আর হেরা গুহাও নবুয়তপ্রাপ্তি উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ওহীর গুরুভার সামলাইবার সামর্থ্যের জন্য ছিল (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এবং মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণে সামর্থ্যবান হওয়ার জন্য ছিল। (মেরাজের বয়ান দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে অজ্ঞ হইয়া বিজ্ঞগণের ধার না ধারিলে গোমরাহ–ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

আর একটা প্রবঞ্চনায় বলা হইয়াছে, "নবুয়তের পরও হযরতের হৃদয় ঈমান শূন্য ছিল।" (পৃষ্ঠা–১৯৯) এই প্রবঞ্চনার উৎস বাক্যটি মে'রাজের হাদীছে রহিয়াছে, অতএব তাহার আলোচনা তথায় হইবে।

"আমার ভ্রাতা মোহাম্মদকে বাঁচাও প্রভু তুমি
কিশোর-তরুণ দীর্ঘজীবী দেখব তাঁকে আমি
দেখব তাঁকে সাহেব-সর্দার সবার চেয়ে বড়
তাঁহার শত্রু তাঁহার হিংসুক সবকে ধ্বংস কর
চির গৌরব, চির সম্মান, সদা দৃষ্টি তোমার
তাঁহার জন্য অটুট রাখ এই কামনা আমার।"

(যোরকানী-১-১৪৬)

হালিমা পরিবারের সকলেই মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, শুধু ওনায়সা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবি হালিমার স্বামী হারেসের ইসলাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর একদা হারেস মক্কায় আসিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট বলিল, তোমার দুগ্ধপোষ্য ছেলে কি বলে তাহা জান কি? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে? তাহারা বলিল, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ মানুষকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং আল্লাহর দুই রকম ঘর আছে; নাফরমানদেরকে এক প্রকার ঘরে শাস্তি দিবেন এবং ফরমাবরদারদিগকে অপর এক প্রকার ঘরে শান্তি ও পুরস্কার দিবেন- এই শ্রেণীর আরও বহু রকম কথার দ্বারা সে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

হারেস নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, লোকেরা অভিযোগ করে আপনি নাকি বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং বেহেশত বা দোযখে যাইবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, সত্যই আমি ইহা বলিয়া থাকি; ঐদিন আসিলে আমি আপনাকে হাতে ধরিয়া আজিকার এই আলোচনার সত্যাসত্য দেখাইয়া দিব। হারেস তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। তিনি বলিতেন, আমার এই ছেলে কেয়ামতের দিন যদি আমার হাত ধরে তবে আমাকে বেহেশতে না পৌঁছাইয়া কি আমার হাত ছাড়িবে? (হাশিয়া সীরাতে ইবনে হেশাম- ১৬১)

নবীজী (সঃ) আপন পিতা-মাতার সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; জন্মের পূর্বে পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে হারাইয়াছিলেন। পিতা-মাতার সেবা সম্পর্কে নবীজীর অতুলনীয় শিক্ষা রহিয়াছে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন-

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার ভক্ত সুসন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টি করিলে প্রতি দৃষ্টিতে আল্লাহর দরবারে এক একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক দিনে একশতবার দৃষ্টি করিলেও (ঐরূপ একশত হজ্জের সওযাব পাইবে?)। হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ- আল্লাহ তাআলা অতি মহান অতি পবিত্র (দানে তিনি কুণ্ঠিত নহেন)।

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার সেবা শ্রদ্ধায় যেব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হইবে, তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরজা খোলা থাকিবে; তাঁহাদের একজনের ব্যাপারে ঐরূপ হইলে বেহেশতের একটি দরজা খোলা থাকিবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়। হযরত (সঃ) তিন বার বলিলেন, যদিও তাহার প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি পরিমাণ? হযরত (সঃ) বলিলেন, পিতা-মাতাই তোমার বেহেশত-দোযখ।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টি; পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের অসন্তুষ্টি।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাওযার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার মা আছেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ আছেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, মাতার সেবায় লাগিয়া থাক; বেহেশত জননীর চরণতলে। (সমুদয় হাদীছ মেশকাত শরীফ হইতে সংগৃহীত।)

এতদ্ভিন্ন হাদীছে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা তিন গুণ বেশী। পিতা-মাতাহারা নবীজীকে পিতা-মাতার সেবায় পুত্ররূপে দেখিবার সুযোগ থাকে নাই, কিন্তু শুধু স্তন্যদায়িনী মাতা হালিমার প্রতি হযরত (সঃ) যে ব্যবহার এবং ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীজীর আপন পিতা-মাতার সেবার সুযোগ পাইলে তিনি কি আদর্শ স্থাপন করিতেন।

হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি হযরত (সঃ) অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়নের যুদ্ধ বন্দীগণকে যে হযরত (সঃ) মুক্তি দান করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ঐতিহাসিক উদারতা প্রদর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, যুদ্ধ-বন্দীগণের মধ্যে হযরতের দুধ-মা হালিমার বংশীয় নারীগণও ছিল এবং মুক্তির আরজি পেশকারীগণ হযরতের সম্মুখে সেই বিষয়টিকে বিশেষরূপে তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহাদের বিশিষ্ট সুবক্তা যোহায়র বলিয়াছেন–

يارسول الله انما فى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك

অর্থ ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! বন্দিশালায় বন্দীদের মধ্যে আপনার খালা রহিয়াছেন এবং ঐ রমণীগণ রহিয়াছেন যাহারা শিশুকালে আপনার লালন-পালন করিয়াছেন।"

যোহায়র এই সম্পর্কে একটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিল–

أُمْنُنْ عَلٰى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ـ اِذْ فُوكَ تَمْلَؤُهٗ مِنْ مَخْضِهَا الدُّرَرُ

اِذْ كُنْتَ طِفْلاً صَغِيْراً كُنْتَ تَرْضَعُهَا ـ وَاِذْ يُرَنِّيْكَ مَا تَاْتِىْ وَمَا تَذَرُ

অর্থ ঃ "দয়া করুন ঐসব রমণীর প্রতি যাহাদের (আপন জনের) স্তনের দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছেন– যাহাদের দুগ্ধের মুক্তাগুলি (ফোঁটাসমূহ) আপনার মুখকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকিত।

আপনি যখন ছোট শিশু ছিলেন তখন আপনি তাহাদের দুগ্ধপান করিয়া থাকিতেন–

যখন আপনি কোন কাজ করিতে বা কিছু হইতে উদ্ধার পাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন– একমাত্র কাঁদা ব্যতীত আপনার কোন উপায় থাকিত না।" (আল্‌-বেদায়া ওয়ান্‌ নেহায়া ৪–৩৫২)

এইসব উক্তি হযরতের দুধ মা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিল। অবশেষে হযরত (সঃ) ঐসব যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের ঘোষণা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মুসলমানগণকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে ঐ ব্যাপারে রাজি করিলেন।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, আবুত্‌ তোফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়েন এলাকায় জেহাদকালে) হযরত নবী (সঃ) (মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল দূরে) জেয়ে'ররানা নামক স্থানে একদা গোশত বন্টন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য রমণী হযরতের প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানা বিছাইয়া দিলেন। রমণী আসিয়া সেই চাদরের উপর বসিলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রমণী কে? তখন উপস্থিত সকলে উত্তর করিলেন, তিনি হইলেন হযরতের দুধ মা। (এসাবা ৪–২৬৬)

ইহার পূর্বে আরও একবার বিবি হালিমা হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন, তখনও হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত হযরতের বিবাহের পরের ঘটনা– একবার হালিমার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; বিবি হালিমা মক্কায় হযরতের নিকট আসিয়া সাহায্য

কামনা করিলেন। হযরত (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট বিবি হালিমাকে সাহায্য করার বিষয় আলাপ করিলেন; খাদিজা (রাঃ) বিবি হালিমাকে বিশটি মেষ এবং কতিপয় উট দিয়া দিলেন।

(যোরকানী, ১-১৫০)

হযরত (সঃ) তাঁহার সেবাকারিণী দুধভগ্নী শায়মার প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়ন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য হযরতের নিকট যে প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল, সেই উপলক্ষে হযরতের সেই ভগ্নী শায়মাও হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্যও স্বীয় চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিলেন। -(যাদুল-মাআদ)

হযরতের শৈশব

নবীজী (সঃ) শিশু অবস্থায়ই সব সময় ডান স্তনের দুধ পান করিতেন; উভয় স্তন একা পান করিতেন না, দুধ ভ্রাতার জন্য এক স্তন অবশ্যই ছাড়িয়া রাখিতেন; শিশুকালেই তিনি এতদূর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

(নশরুত তীব-২৩)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক উঠতি সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অসাধারণ ছিল; দুই বৎসর বয়সেই তিনি বেশ বড় দেখাইতেন। (সীরাতে খাতম-২৮)

দুধ ছাড়াইবার পর সর্বপ্রথম তাঁহার মুখে এই কথা ফুটিয়াছিল

الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا -

"আল্লাহ মহান- সর্ব মহান। আল্লাহ তাআলার অংসখ্য প্রশংসা। সকাল-বিকাল সর্বদা আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করি।" (ঐ- ২১)

নবীজী (সঃ) এই বয়সে বাহিরে যাইতেন, কিন্তু তিনি খেলা-ধুলায় লিপ্ত হইতেন না; অন্য ছেলেদেরকে খেলিতে দেখিয়াও খেলায় অংশগ্রহণ করিতেন না। (ঐ)

বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে কোথাও দূরে যাইতে দিতেন না। একদা বিবি হালিমার অজ্ঞাতে হযরত তাঁহার দুধভগ্নী শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরের সময় পশুপালের চারণ ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। বিবি হালিমা হযরতের খোঁজে বাহির হইলেন এবং শায়মার সহিত তাঁহাকে পাইলেন। বিবি হালিমা শায়মার উপর রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি এই প্রখর রোদ্রে এবং উত্তাপের সময়ে কেন তাঁহাকে বাহিরে নিয়া আসিয়াছ? শায়মা বলিল, আমার ভাই উত্তাপ ভোগ করে নাই; আমি দেখিয়াছি, একটি মেঘখণ্ড সর্বদা তাঁহাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে। ভাই যখন চলিত তখন মেঘখণ্ডও চলিত, ভাই যখন থামিয়া থাকিত তখন মেঘখণ্ডও থামিয়া থাকিত। (নশরুত তীব-২১)

শৈশবে নবীজীর উসিলায় আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল; বিবি হালিমার বর্ণনায় সেইরূপ অনেক বিবরণ রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীর ঘটনা মক্কায়ও ঘটিয়াছে।

মক্কায় ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোরায়েশ সর্দারগণ খাজা আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালেব! সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ; বৃষ্টির জন্য প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন। আবু তালেব বালক নবীজীকে সঙ্গে করিয়া ক'বা শরীফের নিকট আসিলেন। নবীজী (সঃ) তখন নিতান্তই বালক; তিনি স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশপানে উত্তোলনপূর্বক নিবেদনকারীর ন্যায় অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাত মেঘবিহীন পরিষ্কার আকাশে অসাধারণ মেঘমালার সঞ্চার হইল এবং প্রবল বারিপাত হইল।

এক সময় মক্কাবাসীরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শত্রুতায় মাতিয়া উঠিল। নবীজীর

প্রশংসায় খাজা আবু তালেব স্বীয় কবিতায় এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং তাহা বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে। (পৃষ্ঠা-১৩৭)

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ ـ ثِمَالُ الْيَتٰمٰى عِصْمَةٌ لِّلْاَرَامِلِ

মেঘের বৃষ্টি আসে তাঁহার নূরানী চেহারায়!
এতীমগণের পালক তিনি, বিধবার আশ্রয়!!

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনায় একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনাবৃষ্টির দরুন এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে যে, দুধের অভাবে শিশুদের শব্দ করার পর্যন্ত শক্তি নাই। তৎক্ষণাত রসূল (সঃ) মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায়ই হাত উত্তোলনপূর্বক দোয়া আরম্ভ করিলেন। দোয়ার হাত নামাইবার পূর্বে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল; লোকগণ পানিতে ভিজিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নবীজী (সঃ) হাসিমুখে বলিলেন, আজ আবু তালেব জীবিত থাকিলে এই ঘটনা দৃষ্টে তিনি আনন্দিত হইতেন; তাঁহার কাব্যের বাস্তবায়ন এই ঘটনায়ও রহিয়াছে। এই বলিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, কেহ আছে কি যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়? আলী (রাঃ) উল্লিখিত পংক্তিটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। (যোরকানী, ১-১৯১)

হযরতের মাতৃবিয়োগ

নবীজীর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জন্ম, শৈশব ও বাল্যকাল শোক-ব্যথা এবং দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাবীবের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বিশ্বনবীর জন্য তাহারই প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের সংখ্যাগুরু মানুষ দুঃখী-দরদী, তাহাদের দুঃখে-দরদে বিশ্বনবীকে অংশীদার হইতে হইবে; সুতরাং বাল্যকালের এ অবস্থার মধ্য দিয়াই তিনি দুঃখ-দরদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইবেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থায় অভিজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

এই তথ্য আল্লাহ তাআলাও কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন-الم يجدك يتيما فاوى "আপনি এতীম ছিলেন; পরে আল্লাহ আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইতিহাসের বিভিন্ন মতামত দৃষ্টে বলিতে হয়, নবীজীর বয়স চারি হইতে নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

দুগ্ধপানের বয়স এবং তাহারও পর কিছুকাল নবীজী (সঃ) দুধ মায়ের প্রতিপালনে থাকিয়া দীর্ঘ দিন পর আপন মা বিবি আমেনার স্নেহ ছায়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বিবি আমেনার অন্তরে কতই না আনন্দ। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, প্রাণের দুলাল শিশু নবীজী (সঃ)-কে লইয়া মদীনায় যাইবেন। নবীজীর পিতামহের মাতুলকুল মদীনায়, নবীজীর পিতার কবর মদীনায়। স্বামীহারা আমেনার সাধ জাগিল শ্বশুরের মাতৃকুলের সকলকে দেখাইবে- মৃত আবদুল্লাহর ঘরে আল্লাহ কি সোনার চাঁদ দান করিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে শত আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়া যেয়ারত করিবেন স্বামী আবদুল্লাহর কবর। বিবি আমেনা গর্ভ অবস্থা হইতে এই সময় পর্যন্ত নবীজী (সঃ) সম্পর্কে বহু কিছুই দেখিয়াছিলেন, উপলব্ধি করিয়াছিলেন- কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছেন তাহা

বুঝিবার তাঁহার বাকী ছিল না। অথচ এহেন পুত্ররত্ন লাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চির বঞ্চিত; এই চাঁদের মুখ দেখিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিবি আমেনা সোনার পুত্র লাভের যে আনন্দ পাইয়াছেন সেই আনন্দের পার্শ্বে তাঁহার মনোবেদনা সমধিকই ছিল নিশ্চয়। তাই অন্ততঃ স্বামীর মাজারে পুত্রধনকে লইয়া না গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন কি?

আনন্দ ও আবেগভরা অন্তর লইয়া বিবি আমেনা প্রাণের দুলাল বালক নবীজী (সঃ)-সহ মদীনাপানে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিয়াছে পরিচারিকা উম্মে আয়মান। শিশু পুত্র আর দাসী– শুধু এই দুই সঙ্গী লইয়া বিবি আমেনা একাই প্রায় তিন শত মাইলের দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌঁছিবেন; কী দুঃসাহসিক কার্য! ভাঙ্গা বুকের আবেগ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সাহসে বুক বাঁধিতে, প্রেরণা যোগাইয়াছে সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর জয় করিতে। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় উপস্থিত হইতে কৃতকার্য হইলেন।

বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) সহ মদীনায় এক মাস অবস্থান করিলেন; তৎকালীন মদীনার কোন কোন স্মৃতি নবীজীর স্মরণও রহিয়াছে। হিজরত করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আসিয়াছেন তখন তিনি ছাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনায় বলিয়াছেন, এই গৃহে আমি আমার আম্মার সহিত অবস্থান করিয়াছিলাম। এমনকি ঐ সময় নবীজী (সঃ) তথায় এক বাড়ীর একটি জলাশয়ে ভালরূপে সাঁতার কাটাও শিখিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (যোরকানী, ১–১৬৪)

পরিচারিকা উম্মে আয়মানের বর্ণনা– ইহুদীদের কিছু লোক বালক নবীজীকে উদ্দেশ করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা আমি তাহাদের একজনের উক্তি শুনিতে পাইলাম, সে সঙ্গীগণকে বলিতেছে, এই বালক এই যুগের নবী হইবেন এবং এই মদীনা তাঁহার হিজরত স্থান হইবে। তাঁহার উক্তিগুলি আমি সুরক্ষিত রাখিলাম।

নবীজীর মাতা বিবি আমেনাও ঐ শ্রেণীর উক্তির সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং বালক নবীজী (সঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের তরফ হইতে আশঙ্কা বোধ করিলেন। সেমতে কালবিলম্ব না করিয়া বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) ও পরিচারিকা উম্মে আয়মানসহ মদীনা হইতে মক্কা ফিরিয়া আসার জন্য যাত্রা করিলেন। মক্কা-মদীনার মধ্যে অর্ধ পথ পূর্বে 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছিয়া বিবি আমেনা অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্য! মরুভূমির বুকে উন্মুক্ত আকাশতলে পাহাড়-পর্বতের মাঝে পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ কাছে নাই, এক দাসীর সহিত একা এই বালক! ইহা অপেক্ষ ভীষণ আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় দাসী উম্মে আয়মান বিবি আমেনাকে কবর দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে লইয়া মক্কায় পৌঁছিলেন।

নবীজীর দুঃখ-বেদনার কি সীমা থাকিল! পিতার ত মুখই দেখেন নাই; দুনিয়ায় আসিবার পূর্বেই পিতাকে হারাইয়াছেন, এখন আবার শিশু বয়সেই এক হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য মাঝে মাতাকে হারাইলেন। মক্কা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন মায়ের সাথে; মাত্র একমাস পরেই আজ মক্কায় ফিরিলেন একা– মাকে পথিমধ্যে দূর প্রান্তরে রাখিয়া আসিলেন কবরে।

এত ব্যথা! কিন্তু এখনও নবীজীর দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয় নাই; পিতাহারা নবীজী মাকে হারাইয়া যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেন, মাত্র দুই বৎসরেই আবার তাঁহাকে হারাইবার শোকে আক্রান্ত হইলেন। মাকে চির বিদায় দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় পৌঁছিলেন; দাদা আবদুল মোত্তালেব তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। দাসী উম্মে আয়মানও সেই দায়িত্বে অংশীদার।

উম্মে আয়মান

নবীজীর পিতার মুক্ত দাসী ছিলেন উম্মে আয়মান। (যোরকানী–১৬৩) তিনি হাবশী তথা আবিসিনিয়ার ছিলেন; নবীজীর বাল্য বয়সের বিশিষ্ট সেবাকারিণী ছিলেন তিনি। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী

ছিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বলিয়া থাকিতেন, আমার (গর্ভধারিণী) জননীর পরে আপনিই আমার জননী। (যোরকানী, ১-১৮৮) তিনি বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ)-এর নিজের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। মদীনার কোন কোন ছাহাবী নবীজীকে কতিপয় খেজুর গাছ প্রদান করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই খেজুর গাছ হইতে উম্মে আয়মান (রাঃ)-কে কয়েকটি দান করিয়াছিলেন। নবীজীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত নিজ প্রচেষ্টায় উম্মে আয়মানকে বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যধিক ভালবাসিতেন। এমনকি ছাহাবীদের মধ্যে তিনি "হেব্বু রসূলিল্লাহ"- রসূলুল্লাহর প্রিয়পাত্র আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।

উম্মে আয়মান (রাঃ) নবীজীর সেবা করিয়া ইহ-পরকালে পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। লোকমুখে তিনি "বরকত" নামে পরিচিতা ছিলেন। বর্ণিত আছে- একদা "রওহা" নামক মরু প্রান্তরে তিনি পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন। কোথাও পানির ব্যবস্থা নাই। ঐ সময় রেশমী দড়িতে ঝুলানো পানিভরা ডোল আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল; তিনি সেই পানি পান করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন যে, পরবর্তী জীবনে কখনও পিপাসার যাতনা ভোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর উত্তপ্ত দিনের রোযায় দ্বিপ্রহরকালেও আমি পিপাসা অনুভব করি না। (যোরকানী, ১-১৮৮)

নবীজীর ইন্তেকালে তিনি অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার ক্রন্দনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুনিয়া ত্যাগের ৫/৬ মাস পরই তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দাদাকেও হারাইলেন নবীজী (সঃ)

পিতা-মাতাহারা নবীজী (সঃ) দাদা আবদুল মোত্তালেবের আশ্রয়ে থাকিতেন। আবদুল মোত্তালেব নবীজী (সঃ)-কে সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা করিতেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার ছিলেন। তাঁহার জন্য প্রত্যহ কা'বা গৃহের সন্নিকটে বিশেষ বিছানা করা হইত; অন্য কেহ এমনকি আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানরাও ঐ বিছানার উপর যাইতে পারিত না। বালক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিনা বাধায় ঐ বিছানার উপর বিচরণ করিতেন; স্নেহ-মমতায় আবেগপূর্ণ আবদুল মোত্তালেব আদর ও ভালবাসার দৃষ্টিতে স্বীয় পৌত্র নবীজীর এই আচরণ উপভোগ করিতেন। চাচাগণ নবীজীকে বিছানা হইতে হটাইতে চাহিলে আবদুল মোত্তালেব বাধা দিয়া বলিতেন, বাছাধনকে বিরক্ত করিও না। আমার এই বাছাধনের ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল। (যোরকানী, ১-১৮৯)

আপদ-বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায় মানুষের ধৈর্য, সাহস এবং উদ্যম বলিষ্ঠ হয়, তাই যেন বিধাতা নবীজীকে আঘাতের পর আঘাত, দুঃখের পর দুঃখ, ব্যথার পর ব্যথায় ফেলিয়া তাঁহার জীবন বুনিয়াদ মজবুতরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পিতা-মাতাকে হারাইবার পর দাদা আবদুল মোত্তালেবের ছায়া নবীজীর জন্য সুদীর্ঘ হইল না। নবীজীর মাতৃবিয়োগের মাত্র দুই বৎসর পরেই দাদা আবদুল মোত্তালেব বালক নবীজীকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র আবু তালেবকে অসিয়ত করিয়া গেলেন নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তিনি নবীজীর পিতা খাজা আবদুল্লাহর এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা ছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীর্ঘ দিন আবু তালেবের ছায়ায় ছিলেন; হযরত (সঃ) নবী হওয়ারও সাত বৎসর পর আবু তালেবের মৃত্যু হইয়াছিল। আবু তালেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য-সহায়তায় সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিয়া যাইতেছিলেন।

নবীজীর মাতা-পিতা সম্পর্কে

নবীজী (সঃ) পিতাকে দেখেন নাই, মাতাকে বাল্যাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবনই মৃত পিতা-মাতার প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। মক্কা বিজয় বা ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনার সফরে

মক্কা হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে "আবওয়া" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) স্বীয় মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছিলেন। নবীজীর অন্তরে যে কি আবেগ ছিল! মায়ের কবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবীজী (সঃ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে, আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন নিজ মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছেন; তখন তিনি এইরূপ কাঁদিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণকে পর্যন্ত কাঁদাইয়া ফেলিয়াছেন। মায়ের মমতাই মাতৃহারা নবীজীকে এইরূপ অভিভূত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি আজ নবী, কিন্তু মা তাঁহাকে নবীরূপে পান নাই– সেই ব্যথাও কম নহে। এত দুঃখ– এত ব্যথা! এই অবস্থায় নবীজী (সঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে– নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, "পরওয়ারদেগারের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়াছিলাম; অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কবর যেয়ারতের অনুমতি চাহিয়াছি; সেই অনুমতি পাইয়াছি।" ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাইয়া নবীজীর মনের আবেগ ও ব্যথা কি চরম আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান– ঈমান ব্যতিরেকে ক্ষমা হইবে না; আল্লাহ তাআলার এই বিধান সকলের জন্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলা কি স্বীয় হাবীবের এই ব্যথার লাঘব করিবেন না? এই আবেগের মূল্য দিবেন না? ইহা ত আল্লাহর হুজুরে বড় কথা যে, তাঁহার হাবীবের অন্তরে ব্যথা ও অশান্তি। নবীজী (সঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-অঙ্গীকার বিঘোষিত রহিয়াছে– ولسوف يعطيك ربك فترضى "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্বক আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিবেন।"

এই প্রভু-পরওয়ারদেগার কি স্বীয় হাবীবের অন্তরকে সারা জীবন কাঁদাইবেন? তাঁহার পিতা-মাতার মুক্তি সম্পর্কে কি তাঁহার মনোবেদনা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন না?

পূর্বাপর বহু ইমাম ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবীজী (সঃ)-এর পিতা-মাতা পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের মুক্তির সূত্র সম্পর্কে অধিকাংশের মত এই যে, নবীজীর সন্তুষ্টি ও সম্মান উদ্দেশে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ব্যবস্থা এই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতাকে মুহূর্তের জন্য জীবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহারা জীবিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করতঃ পুনঃ মৃত হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। (যোরকানী, ১– ১৬৬-১৮৮ দ্রষ্টব্য) এমনকি বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবন হাজার (রঃ)ও তাঁহার এক কিতাবে এই বিষয়টির পূর্ণ সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল মোলহেম, ১–৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বাল্যকালে নবীজীর বিদেশ সফর

এক-দুই জন ব্যতীত সকল পয়গম্বরই চল্লিশ বৎসর বয়সে পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ সময়টা ব্যর্থ হইত না; পয়গম্বরীর গুরুদায়িত্ব বহনে তাঁহাদেরকে যোগ্য করা হইত। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ত হইবেন বিশ্বনবী; তাঁহার দায়িত্ব হইবে বিশ্বজোড়া, তাই তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে বিশেষরূপে; তাঁহার পয়গম্বরী জীবনের বুনিয়াদ মজবুত করিতে হইবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া। এই বিশেষ প্রস্তুতি এবং বিশেষরূপে গড়াইবার যোগাড়-আয়োজনেই অতিবাহিত হইয়াছে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ সময়।

নবীজী (সঃ) শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম-বেশী বার বৎসর। বিধাতা তাঁহাকে দেশের বাহিরে পাঠাইবেন। বহির্দেশের বিশাল জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক রচনা এবং পরিচয় ঘটান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সমাধার সুন্দর মুহূর্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরেও আবেগের ঢেউ খেলিয়া উঠিল।

নবীজী (সঃ)-এর মুরব্বী চাচা আবু তালেব সিরিয়ায় বাণিজ্যে যাইবেন; তিনি সফরের যোগাড়-আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার সময় আসিল, তিনি যাত্রা করিবেন। সেই মুহূর্তে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচা আবু তালেবকে ধরিয়া বসিলেন, তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। আবু তালেবের স্নেহ-মমতা তাহাকে নবীজী (সঃ)-এর আবদার রক্ষা করায় বাধ্য করিল; তিনি নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়াই সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

নবীজীর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আজ সূচিত হইল– ভাবী বিশ্বনবী বহির্বিশ্বের ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতি তাই আজ উল্লসিত আনন্দিত। রাজপুত্রের ভ্রমণে পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ নবীজীর চলার পথের দুই ধারেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহার গমনপথের নিকস্থ পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজি সকলেই নিজ নিজ কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে অভিবাদন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। নীল আকাশও নবীজীর সেবায় ব্রতী হইল– ঘন মেঘখণ্ড নবীজী (সঃ)-কে ছায়া দিয়া চলিল। প্রকৃতিরাজির এই সব লীলা সকলে লক্ষ্য না করিলেও যাহারা দেখিয়াছে তাহারা ভাবী বিশ্বনবীকে চিনিতে পারিয়াছে– যাহার সাক্ষ্য সম্মুখে আসিতেছে।

আবু তালেবের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র "বস্‌রা" নগরে পৌঁছিল। তথায় "জিরজীস্" ওরফে "বহিরা" নামীয় এক খাঁটি অভিজ্ঞ পাদ্রী ছিলেন। তিনি তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব মারফত শেষ যমানার নবীর নিদর্শন ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন যীশুখৃস্ট তথা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতিশ্রুত রসূল। ঈসা (আঃ) নবী মোস্তফা (সঃ) সম্পর্কে অনেক প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং খৃস্টান পাদ্রী বহিরা নবীজীর বহু কিছু লক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই নবীজী (সঃ)-কে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আবু তালেবের সওদাগরী কাফেলা ঐ পাদ্রীর ঘরের নিকট অবতরণ করিল। পাদ্রী কাফেলার মধ্যে বালক রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা দেখামাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন যে, এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ যমানার নবী। সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার মধ্যে আসিয়া হযরতের হাত ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, এই ত সকল পয়গম্বরগণের শিরোমণি, এই ত নিখিলের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদ ও মঙ্গলরূপে দাঁড় করাইবেন। কাফের লোকগণ সেই পাদ্রীকে প্রশ্ন করিল, আপনি কিরূপে এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন? পাদ্রী বলিলেন, আপনারা রাস্তার মোড় ফিরিয়া এই অঞ্চলে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমুদয় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি আমি তাঁহার পৃষ্ঠে মোহরে নবুয়ত দেখিতে পাইতেছি; তাহার দ্বারাও তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। অতপর সেই পাদ্রী বস্তুতঃ হযরতের খাতিরে সম্পূর্ণ কাফেলাকে দাওয়াত করিলেন। সকলে খাওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পাদ্রী তাহাদের নিকট হযরতের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সকলে বলিল, তিনি উট চরাইতে গিয়াছেন। পাদ্রী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হযরতকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। যখন হযরত ময়দান হইতে আসিতেছিলেন তখন পাদ্রী লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর একটি মেঘখণ্ড ছায়া প্রদান করিয়া আসিতেছে। যখন হযরত খাওয়ার স্থলে পৌঁছিলেন– যাহা একটি বৃক্ষের ছায়াতলে ছিল; তিনি বৃক্ষের ছায়ায় স্থান না পাইয়া ছায়াহীন জায়গায় বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ডালাগুলি হযরতের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছায়া দান করিল। পাদ্রী উপস্থিত কাফেলার লোকদিগকে বৃক্ষের এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তোমরা এই বালককে লইয়া তোমাদের গন্তব্যস্থল সিরিয়ায় যাইবে না। তথাকার ইহুদীরা এই বালকের নিদর্শন দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে এবং তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যে পাদ্রী দেখিতে পাইলেন, সাত জন রোমীয় লোক ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে। পাদ্রী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খোঁজ করিতেছ? তাহারা বলিল, তওরাত-ইঞ্জীলের বর্ণনা

মারফত আমরা জানি, শেষ যামানার নবী জন্মলাভ করিয়াছে, এই মাসে তিনি এই পথে সফর করিবেন; আমরা তাঁহার তালাশে আসিয়াছি। পাদ্রী তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, খোদার ইচ্ছা কি কেহ ঠেকাইতে পারে? তাহারা পাদ্রীর এই কথায় তাহাদের চেষ্টা ত্যাগ করিল। অতপর পাদ্রী হযরতের চাচা আবু তালেবকে কসম দিয়া বলিলেন, আপনি অবশ্যই এই বালককে সতর্কতার সহিত যথাসত্বর দেশে পৌঁছাইতে যত্নবান হইবেন। সেমতে আবু তালেব (সযত্নে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও) সিরিয়ার বাণিজ্য সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

(সীরাতে ইবনে হেশাম)

এই পাদ্রীর সহিত হযরতের সামান্য কথাবার্তাও হইয়াছিল– তাহার বিবরণও বর্ণিত রহিয়াছে। পাদ্রী বলিলেন, আপনাকে লাত ও ওজ্জা দেবীদ্বয়ের কসম দিতেছি– আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, আমাকে লাত-ওজ্জার কসম দিবেন না, তাহাদেরকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি। তখন পাদ্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম....। এইবার হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পাদ্রী তাঁহাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করিলেন– হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিদ্রা, বিভিন্ন হাল-অবস্থা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বশেষ পয়গম্বরের গুণাগুণ সম্পর্কে ঐ পাদ্রীর যাহা কিছু জানা ছিল তাহার পরীক্ষার জন্যই তিনি হযরত (সঃ)-কে এইসব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে লাত ও ওজ্জা দেবীর কসমও এই উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবী সর্বশেষ নবী হইয়া থাকিলে কখনও তিনি এই কসম গ্রহণ করিবেন না, বস্তুতঃ হইলও তাহাই। (যোরকানী, ২– ৯৬)*

সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হযরতের প্রথম যোগদান

তখনকার আরব দেশ অন্ধকার দেশ, তাহার পরিবেশ অন্ধকার এবং তখনকার যুগ অন্ধকার যুগ– মারামারি, রক্তারক্তি প্রায় সর্বদা লাগিয়াই আছে। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচারই সেই দেশ ও সেই যুগের ইতিহাস।

---

* **সমালোচনাঃ** এক শ্রেণীর খৃষ্টান লেখক মাকড়সার জালের উপর ঘর তৈয়ার করার ন্যায় বহিরা পাদ্রীর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক আজগবী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাকি এই বহিরা পাদ্রীর সাক্ষাত হইতে জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। কি আজগবী আবিষ্কার! কি আজগবী কথা!

অচিরেই যাঁহার জ্ঞান-দর্শনে সারা জগত স্তম্ভিত মুগ্ধ হইল; যাঁহার আদর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ ও পরিবেশকে এবং কুসংস্কার জর্জরিত জাতিকে আদর্শের রাজমুকুট পরাইল, যাঁহার শিক্ষা ও দান বিশ্ব বুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সোনালী আদর্শের বন্যা বহাইয়া দিল, তিনি তাঁহার এই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র ও অমৃতাদর্শের মহাসাগর লাভ করিলেন এক বিন্দুবৎ হইতে। ১২ বৎসর বয়সে মূহূর্তের সাক্ষাত ও দুই-চারি কথার আলাপে। এইরূপ পচা গল্পবাজির উত্তর না দেওয়াই ভাল উত্তর।

আশ্চর্যের বিষয়, "মোস্তফা-চরিত" খৃষ্টানদের ঐ পচা গল্পবাজিতে মস্তক হেঁট করিয়া লজ্জা ঢাকিবার জন্য পেরেশান হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে কোন পথ না দেখিয়া বহিরা পাদ্রীর ঘটনার ইতিহাসকেই অস্বীকার করতঃ হাঁপ ছাড়িতে চাহিয়াছে। মোস্তফা চরিতের ভাষায়– "এই গল্পটিই একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা।" (পৃষ্ঠা–২২০) মোস্তফা চরিত সঙ্কলকের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, যাহা তাহার মনঃপূত না হইবে তাহাকে "গল্প" বলিয়া আখ্যা দিবে, যদিও তাহা জগতভরা ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাদীছ গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে।

বহিরা পাদ্রীর উল্লিখিত ঘটনার বয়ান সীরাতশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, এমনকি সেহাহ সেত্তা হাদীছ গ্রন্থসমূহের তিরমিযী শরীফেও উল্লেখ আছে। মরহুম খাঁ সাহেব তাঁহার মোস্তফা চরিতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতি বিষোদাগারে প্রবঞ্চনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন রেফারেন্স বা বরাতের মারপ্যাঁচে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেনঃ

প্রথমতঃ তিনি ঘটনা বর্ণনার সনদ সম্পর্কে নানারূপ গোঁজামিলের দ্বারা তাহার দুর্বলতা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভূমিকায় বর্ণিত এই বিষয়টি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনার বর্ণনা হইল ইতিহাস। ইতিহাস ভিন্ন জিনিস এবং হাদীছ তদপেক্ষা বহু উর্ধ্বের ভিন্ন জিনিস। হাদীছ বলা হয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা, কাজ এবং সমর্থনকে। আলোচ্য

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স তখন ১৫-১৬। (আসাহহুস সিয়ার) কায়স গোত্রীয় লোকেরা কেরায়শদের সঙ্গে অন্যায়রূপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; সেই যুদ্ধই ইতিহাসে "ফেজার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে কোরায়শগণও যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোরায়শদের শাখা গোত্রসমূহ নিজ নিজ সর্দারের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীরূপে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। বনী হাশেম গোত্রের নেতৃত্ব তাহাদের সর্দার হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের উপর ছিল। হযরতের জীবনের সর্বপ্রথম তিনি সেই যুদ্ধে দাদার সাহায্যকারীরূপে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।

ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের কারণে মক্কায় এতীম-বিধবা, অনাথ-দুর্বলদের সংখ্যা অনেক ছিল। এই দুর্বলদের উপর দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য চলিত নির্বিবাদে।

মক্কার সুমতিসম্পন্ন কতিপয় সর্দার একটি কল্যাণমূলক সমাজ-সেবা সমিতি গঠনে সচেষ্ট হইলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমাজ সেবা সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশগ্রহণপূর্বক বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ-

(১) অসহায় দুর্গতদিগের সাহায্য সেবা করা।

(২) এতীম-বিধবা ও দুবর্লদেরকে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

(৩) কোন বিদেশী বা পথিকের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করা হইলে তাহার আশু প্রতিকার করা।

(৪) সর্বপ্রকার অত্যাচার প্রতিরোধে অত্যাচারীকে দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।

(৫) দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৬) সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা করা।

সমিতির সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন- ইহারই ঐতিহাসিক নাম 'হেলফুল ফজুল'। অন্ধকার যুগে ইহাই ছিল কিঞ্চিৎ আলোর সর্বপ্রথম উদ্ভাসন। বিশ্ব ভূমণ্ডলের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সকলের জন্য এক নবী- এই ব্যতিক্রম রূপের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার দ্বারা প্রকৃত শান্তি এবং কল্যাণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সূচনায় যুগ-যুগান্তের অন্ধকার কাটিয়া

বিবরণটি ত নবীজীর পয়গম্বরী জীবনের বহু পূর্বেকার ঘটনা, যাহা ইতিহাসরূপে অন্য লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ গৃহীত হওয়ার জন্য তাহার সনদে যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাহা ইতিহাসের বেলায় প্রয়োগ করিলে ইতিহাস ভান্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে; গ্রহণযোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুধী সমাজ! ইতিহাস ভাণ্ডার তলাইয়া দেখুন, শতকরা ৫০ ভাগ সনদহীন বর্ণনাই তাহাতে পাইবেন, তাহাও ইতিহাসের আরবী গ্রন্থাবলীতে। অন্যান্য ভাষার ইতিহাস বই-পুস্তকে ত সনদের কোন বালাই-ই নাই। পূর্বাপর যেসব ইতিহাস গ্রন্থ গৃহীতরূপে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ গন্থে এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে আলোচ্য বহীরা পাদ্রীর ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। সুতরাং সনদের দুর্বলতার দোহাই দিয়া তাহা উপেক্ষা করা প্রতারণার শামিল হইবে। অধিকন্তু মোস্তফা চরিত পুস্তকে দুই-এক জন আলেমের ভিন্ন মত পোষণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এইরূপ সামান্য দ্বিমতের দরুন ইতিহাসের বর্ণনা উপেক্ষা করিলে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য মিলিবে না।

অসংখ্য ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত হওয়া এবং হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ছয় ইমামের এক ইমাম তিরমিযী (রঃ) কর্তৃক গ্রহণীয় সাব্যস্ত হওয়া এই ঘটনার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সীরাত সঙ্কলনে কলিযুগের লিখক মরহুম মাওলানা শিবলী নোমানী এবং মরহুম মাওলানা আকরম খাঁর লেখায়ই এই ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি দেখা যায়, নতুবা পূর্বাপর সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টান লেখকদের অযৌক্তিক পচা গল্পবাজির ভয়ে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা চরম দুর্বলতার পরিচয়ই বটে।

মোস্তফা-চরিতে এই বর্ণনার আর একটি দুর্বল দিক দেখান হইয়াছে যে, ঘটনাটির বর্ণনায় আছে, বহিরা পাদ্রীর উপদেশ মতে হযরতের মক্কায় প্রত্যাবর্তনে আবু বকর (রাঃ) বেলালকে সঙ্গে দিলেন। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে; ঐ সময় আবু বকরের বয়স ১০ বৎসর ছিল। কারণ আবু বকর (রাঃ) হযরতের দুই বৎসরের ছোট ছিলেন, আর ঐ সময় হযরতের বয়স ১২ বৎসর ছিল।

উত্তর এই যে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, আবু বকর ঐ সফরে ছিলেন না। তাঁহার থাকা অসম্ভব নহে। নবী (সঃ) যদি ১২

ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব শান্তির দীপ্ত সূর্যের উদয়াভাসে এই শ্রেণীর রশ্মির বিকাশ অতি স্বাভাবিকই ছিল।

দেশের বরেণ্যরূপে হযরতের খেতাব লাভ

ইতিমধ্যেই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টিতেই তিনি অতুলনীয়রূপে দেখা যাইতে লাগিলেন। মানব-সেবা, মানব-প্রেম, নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনা, সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সততা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর মাধুর্যে সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি দিনে দিনে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলে কাহারও প্রস্তাব-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে সকলের মুখে তাঁহার জন্য এমন একটি খেতাব বা উপাধি আবিষ্কৃত হইল যাহা মহৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষের প্রতীক। সারা দেশ তাঁহাকে 'আল-আমীন' আখ্যায় ভূষিত করিল। আরবী ভাষায় এই শব্দটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মানবীয় মহত্ত্বের অসংখ্য উপাদান এই অক্ষর কয়টির মধ্যে পরিবেষ্টিত। শান্তিপ্রিয়, সম্প্রীতির আধার, চরম সত্যবাদী ও পরম বিশ্বস্ত– এইসব মাহাত্ম্যের আকরকে আরবী ভাষায় বলা হয়, 'আমীন' এবং তাহারই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যধারীকে বলা হয় 'আল-আমীন'। গুণ-মাধুর্যের কত উচ্চ মূল্য জাতির পক্ষ হইতে নবী (সঃ) পাইলেন? 'আল-আমীন' উপাধি তাঁহার পরিচয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল; নামের পরিবর্তে সকলে তাঁহাকে 'আল-আমীন' বলিয়া ডাকিত। অন্ধকার যুগ, অন্ধকার দেশ, অন্ধকার পরিবেশ– এই দুর্ধর্ষ জাতির চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখকার দিনে সহজসাধ্য ছিল কি? কিরূপ চারিত্রিক মাধুর্য এবং সততা গুণের সুষমা ও মানব সেবার অকৃত্রিম প্রেরণা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার জন্য আল্লাহর দেওয়া সাধারণ গুণের প্রভাবেই এত বড় গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হযরতকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দান

শৈশবকালই মানুষের শিক্ষার সময়, কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর দেশ যুগ অন্ধকার দেশ ও যুগ; সেই পরিবেশে পিতা-মাতাহীন নবীজীর শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই জন্য কি তিনি শিক্ষাহীন ছিলেন, তাঁহার শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই? 'উম্মী নবী'-র কি অর্থ ইহাই যে, তিনি নিরক্ষর

বৎসর বয়সে ঐ সফরে থাকিতে পারেন তবে ১০ বৎসর বয়সের আবু বকরও থাকিতে পারেন। আর ইতিহাসে ইহাও প্রমাণিত যে, আবু বকর হযরতের বাল্যবন্ধু ছিলেন। আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে, বেলাল ঐ সময় তথায় থাকিতেই পারেন না। কিন্তু এই সম্পর্কেও দুইটি বক্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে– (১) কাহারও মতে বেলাল আবু বকরের সমবয়স্ক ছিলেন– (যোরকানী, ১–১৯৬)। সুতরাং আবু বকরের শুধু সঙ্গী হিসাবে বেলালের তথায় থাকা অসম্ভব নহে। (২) এই বেলাল প্রসিদ্ধ বেলাল হাবশী (রাঃ) না বেলাল নামের অন্য কোন ব্যক্তি তাহা নির্ধারণেরও কোন প্রমাণ নাই। (কাওকাবুদ্দুরি ২–৩১২) বেলাল হাবশী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কেহ হইলে কোন প্রশ্নই থাকে না।

সারকথা, এইসব ছুতানাতা দুর্বল অজুহাত খণ্ডন করা সহজ, অতএব তাহার দরুন ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইহাছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা শুধু বাহুল্যই বটে। যেমন– বর্ণনায় উল্লেখ আছে, বহিরা পাদ্রী নবীজীর পরিচয় লাভ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমনে এতদঞ্চলের সমুদয় পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সেজদারত হইয়াছিল। মরহুম খাঁ সাহেব এই বিবরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা উল্টিয়া পড়িল– আবু তালেব বা দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিল না; তাহা দেখিলেন বহু দূরে অবস্থিত বহিরা পাদ্রী তাঁহার মাঠের কোণে বসিয়া– ইহা অপেক্ষা আজগবী কথা আর কি হইতে পারে।" (পৃষ্ঠা–২৪৪)

প্রশ্নটির মূল হেতু খাঁ সাহেবের গর্ভেই জন্ম নিয়াছে। মূল ঘটনায় ত রহিয়াছে সেজদারত হইয়াছে; আর খাঁ সাহেব বুঝিয়াছেন, "হযরতকে সেজদা করার জন্য পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালাগুলি ভূপাতিত হইয়াছে।" মানুষের সেজদা এবং পাহাড় ইত্যাদির সেজদাকে খাঁ সাহেব এক আকারে বুঝিয়াছেন– এই বোকামির ফলেই ঐ প্রশ্ন জন্মিয়াছে। কোরআনে উল্লিখিত স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– وان من شئ الا يسبح بحمده .

"দুনিয়ায় যত জিনিসই আছে তাহার প্রত্যেকটিই আল্লাহর প্রশংসায় তাঁহার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে।"

খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকেরা বলিবেন, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বতের মুখ নাই, প্রশংসা ও তসবীহ কিরূপে করে?

অশিক্ষিত ছিলেন? কখনও নহে– ইহা 'উম্মী নবী' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। 'উম্ম' অর্থ মা; তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত 'ইয়া–ী' সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ের সম্পৃক্তি ও সান্নিধ্যে প্রকৃতির শিক্ষা যেভাবে মানুষ লাভ করে, যদিও তাহা সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত। কিন্তু তাহাও এক সুদীর্ঘ শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষা কোন গুরু বা শিক্ষক, কিতাব বা বই-পুস্তক, শিক্ষাগার বা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয় না। তদ্রূপ নবীজী মোস্তফার অপরিসীম শিক্ষা ও পরিধিহীন জ্ঞানার্জন ঐসব মাধ্যম ব্যতিরেকে সকল জ্ঞানের আকর সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুপ্রশস্ত, সুগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য সারা বিশ্ব বহন করে– এই অসাধারণ জ্ঞান তিনি জাগতিক গুরু ও শিক্ষক ব্যতিরেকে মায়ের নিকটে থাকাবস্থায় উপার্জিত প্রাকৃতিক জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক ও বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতিরেকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবী উম্মী' বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই হযরত (সঃ)-কে হাতে-কলমে শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়া বিশেষ গুণে গুণান্বিত এবং বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধাতা অতি যত্নের সহিত নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর পয়গম্বরী জীবনের গঠন কার্য চালাইয়াছেন। সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে এই শ্রেণীর কতিপয় বিষয়ের উল্লেখও রহিয়াছে। যথা– (১) আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথম হইতে পিতা-মাতাহীন এতীম বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষরূপে এতীম নিরাশ্রয়ের দুঃখ-দরদ বুঝিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের মন রক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

"আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এতীম বানাইয়া পরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَاتَقْهَرْ" সুতরাং আপনি এতীমকে ধমক দিয়া কথা বলিবেন না– তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।

(২) আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত (সঃ)-কে কপর্দকশূন্য, রিক্তহস্ত ও দরিদ্র বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি দরিদ্রের দুঃখ-দরদ প্রত্যক্ষরূপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হন এবং সেই দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি উদারতার ব্যবহার করিতে ত্রুটি না করেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে রিক্তহস্ত দরিদ্র বানাইয়া পরে সচ্ছলতার ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ সুতরাং আপনি দারিদ্র্যের আঘাতে যাঞ্চায় লিপ্ত মানুষকে ধিক্কার দিবেন না।"

আরও শুনুন– ولله يسجد ما فى السموت وما فى الارض

"আল্লাহর জন্য সেজদা করিয়া থাকে যাহা কিছু আসমানসমূহে এবং ভূপৃষ্ঠে আছে।" (পারা–১৪ রুকু–১২)

হে খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকগণ! পারা–১৭, রুকু–৯ -এ আরও একটি আয়াত শুনুন–

الم تر ان الله يسجد له من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .

"তুমি কি দেখ না! আল্লাহর জন্য সেজদা করে যাহারা আসমানসমূহে আছে এবং যাহারা ভূপৃষ্ঠে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন প্রাণী।"

চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, পবর্তমালা, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীসমূহকে ত সেজদার জন্য ভূপাতিত হইতে দেখা যায় না, সেই জন্য কি কোরআনও অস্বীকার করিতে হইবে?

পাঠক! সেজদা করা একটি ক্রিয়াপদ, তাহার আকার-আকৃতি সাব্যস্ত হইবে তাহার কর্তা পদের সামঞ্জস্যে; ঘোড়াকে গাধার সহিত জুড়িলে ত খচ্চর পয়দা হইবেই।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালার সেজদারত হওয়ার বর্ণনা যেখানে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ছিল, সেখানে ঐ সেজদার কোন আকার নিদর্শন নিশ্চয় বর্ণিত ছিল। সেই কিতাবের অভিজ্ঞ আলেম তৎকালীন খাঁটি দ্বীনদার বহিরা পাদ্রী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবু তালেব এবং অন্যান্যরা ত সেই কিতাবের আলেম-বিদ্বান ছিলেন না, তাঁহারা তাহা কিরূপে দেখিবেন?

(৩) আল্লাহ তাআলা হযরতকে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃসম্বল বানাইয়া পরে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিপক্ব জ্ঞানভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানের আকর বানাইয়াছিলেন যেমন পবিত্র কোরআনে অনত্র আছে–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَاالْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا ـ

"কোরআন কি জিনিস, ঈমান কি জিনিস তাহা পূর্বে আপনি কিছুই জ্ঞাতিতেন না; হাঁ, পরে আমি আপনাকে কোরআন দান করিয়াছি এবং আমি তাহাকে নূর বা আলোর রূপ দিয়াছি।" (আপনাকে সকল জ্ঞানের আকর ও আলো কোরআন দান করিয়া পরিপ জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছি)

আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিঃসম্বল বানাইয়াছিলেন যেন তিনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন পথহারা মানবের অভাবটা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সেই অনুপাতে তাহাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট হন।

সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাহাই বলিতেছেন–

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এইরূপে বানাইয়াছিলেন যে, আপনি কিছু জানিতেন না, পরে আপনাকে (পরিপক্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ- সুতরাং (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) যেসব অমূল্য নেয়ামতসমূহ আপনাকে আপনার প্রভু দান করিয়াছেন তাহা অযাচিতভাবে সকলের মধ্যে ব্যক্ত করতঃ বিতরণ করুন।

এই ট্রেনিং দান প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীছের মর্ম এবং সেই সূত্রেই হযরত নবীজী (সঃ) বিশেষরূপে এই হাদীছের বিষয়বস্তু সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। (হাদীছ– ১৬৬৫)

اخبرنى جابربن عبد الله رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَتَاثَ فَقَالَ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا رَعَاهَا ـ

অর্থ ঃ বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা "মাররুজ্‌জাহ্‌রান" নামক স্থানে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় আমরা "পীলু" নামক (এক প্রকার জংলী) গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম। হযরত (সঃ) আমাদিগকে বলিলেন, যেগুলি (পাকিয়া) কাল হইয়া গিয়াছে ঐগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও; ঐগুলি অধিক সুস্বাদু।

তখন এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ছাগলের রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ– কোন নবী এই রকম হন নাই যিনি ছাগলের রাখালী না করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ "পীলু" গাছ শহরে-বন্দরে হয় না, তাহা সাধারণত বস্তিবিহীন এলাকায় আগাছার ন্যায় জন্মিয়া থাকে। তাহার গোটা বা ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একমাত্র রাখাল শ্রেণীর লোকদেরই হইতে পারে, যাহারা ঐ ধরনের এলাকায় পশুপাল লইয়া ঘুরাফিরা করিয়া থাকে। হযরত (সঃ) শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু পীলু গাছের ফল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দৃষ্টেই প্রশ্নকারী হযরত (সঃ)-কে ছাগলের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। কারণ, আরব দেশে উট এবং ছাগল বা মেষ শ্রেণীর পশুপালই অধিক, কিন্তু উট অতিশয় শক্তিশালী বড় জানোয়ার হওয়ায় তাহার জন্য রাখালের আবশ্যক হয় না এবং সাধারণত তাহার রাখাল সব সময় রাখাও হয় না।

প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত (সঃ) নিজের সম্পর্কে ত 'হাঁ' বলিলেন; তদুপরি ইহাও বলিলেন যে, প্রত্যেক

নবীর দ্বারাই ছাগলের রাখালী করান হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই রাখালী করিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রাখালীর কাজ কিছুদিন ত কচি বয়সে করিয়াছেন; যখন তিনি দুধ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মক্কায় থাকিয়াও কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগলের রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একটু বয়স্ক অবস্থায় হইয়াছিল, কারণ ইহা তিনি আজুরার বিনিময়ে করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৬৬। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰه نَبِيًّا اِلاَّ رَاعِىَ غَنَمٍ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা যত নবীই পাঠাইয়াছেন প্রত্যেক নবীকেই ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছিল। এতদ শ্রবণে ছাহাবীগণ হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ– আমি কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগল চরাইয়া থাকিতাম কয়েক 'কীরাত' (অতি কম মূল্যমানের মুদ্রা)-এর বিনিময়ে।

ব্যাখ্যা ঃ রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্বচ্ছ ধ্যান, গভীর চিন্তা ও নির্মল তপস্যার নীরব সুযোগ লাভ হয় এই জীবনে। অন্তর– সমুদ্রে ভাবের ঢেউ সৃষ্টির জন্য এই জীবনের এই পরিবেশের মুক্ত বাতাস এক বিশেষ অবলম্বন। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, নীচে শ্যামল ভূপৃষ্ঠ বা মরূদ্যান, চতুষ্পার্শ্বে পর্বতমালা বা সবুজ গাছ, সঙ্গী আছে সর্বপ্রকার সৃষ্টি-রহস্যের বাহক পশুপাল। কি দৃশ্য! কি মনোহর! ভাবুকের জন্য ভাব সৃষ্টির সব উপাদানই একত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার চোখের সামনে। এই পরিবেশের সুযোগের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে–

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ

অর্থ ঃ "লক্ষ্য কর না কেন উটগুলির সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি, ঊর্ধ্ব আকাশের ধারণ কৌশলের প্রতি, পর্বতমালার গ্রথন বিধির প্রতি, ভূপৃষ্ঠের সুসমতল বিন্যাসের প্রতি?" প্রকৃতির এই নিবিড় নীরব প্রশান্তি ভাবুকের জন্য কতই না উপভোগ্য।

রাখাল এই মানচিত্রে মনোনিবেশ করিলে সে সৃষ্টিকর্তার মারেফাতের বিরাট ভূমিকায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে। এই রাখালী জীবনে যদি পদার্পণ করেন কোন নবী, তবে তিনি যে এই বিশাল প্রান্তর হইতে কত হীরা-মাণিক্য আহরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের আরও গভীর সম্বন্ধ এই যে, একজন রাখালের কর্তব্য এই বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা– পশুপাল বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, কোনটা হারাইয়া না যায়, কোনটাকে বাঘে না ধরিতে পারে; অথচ প্রতিটি পশু উপযুক্ত আহার পাইয়া সন্ধ্যায় প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে। এই কর্তব্যের সহিত পয়গম্বরী জীবনের কত নিকটতম সম্বন্ধ! পয়গম্বর গোটা একটা জাতির পরিচালক। রাখাল পশুচালক, আর পয়গম্বর মানুষ চালক; আল্লাহর বান্দাদেরকে সুপথে চালনা করা এবং কুপ্রবৃত্তি, কুপরিবেশ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাযত করতঃ ইহ-পরকালের খোরাক জোগাইয়া সকলকে প্রভুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই পয়গম্বরের কর্তব্য। এই কর্তব্যের দায়িত্ব বহন বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার এবং তাহার কর্মগত অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশেই পয়গম্বরগণের জন্য রাখালীর অনুশীলন।

রাখালীর অনুশীলনের মধ্যে ছাগল চরানোর অধ্যায় পয়গাম্বরী জীবনের প্রয়োজন পূরণের পক্ষে নিকটতম সহায়ক। কারণ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ অপরিসীমভাবে নবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন খেয়াল, বিভিন্ন মেযাজ, বিভিন্ন অভ্যাস ও বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সম্মুখীন হইতে হয় নবীকে, তাই তাঁহাকে বিনয়ী, বিনম্র, কোমল এবং সহিষ্ণু হইতে হইবে, ক্রোধের বান ডাকার ঘটনায়ও তাঁহাকে পর্বত সমতুল্য হইয়া ধীরস্থির থাকিতে হইবে।

ছাগলের রাখালী করার মধ্যে এই গুণগুলি বাস্তবরূপে হাসিল হইয়া থাকে। ছাগলের স্বভাব– হাঁটাইলে হাঁটিবে না, ধাক্কাইলে আগে বাড়িবে না, হেঁচড়াইলে শুইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় রাখালের ক্রোধের আগুন লেলিহান হইয়া উঠে, কিন্তু পিটাইলে চেঁচায় এবং লোকদের গালি শুনিতে হয়। অবশেষে তাহাকে রাখাল আপন কাঁধে চড়াইতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার যে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহার নজির কোথাও পাওয়া যাইবে কি? সুধীগণ বলিয়াছেন, কচি-কাঁচার শিক্ষকতা করিতে হইলে পূর্বে ছাগলের রাখালী করার ট্রেনিং দেওয়া অতিশয় লাভজনক হইয়া থাকে।

এই ট্রেনিংয়ের উদ্দেশেই প্রত্যেক নবীকে ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছে, এমনকি বিশ্বনবী সাইয়েদুল-মোরসালীন তাঁহার শান মর্যাদার সম্পূর্ণ অযোগ্য– অতি কম মূল্যমানের মাত্র কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে রাখালীর মজদুরীও করিয়াছেন। ট্রেনিং দানে যাইয়া মানুষ কত কিছু করিতে বাধ্য হয়!

সিরিয়া সফরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মক্কার এক ধনাঢ্য মহিলা "খাদীজা" তিনি লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে লোকদের দ্বারা ব্যবসা চালাইয়া থাকিতেন। হযরতের বয়স তখন ২৪ বৎসর শেষ প্রায়। তখন একদা হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহাকে বলিলেন, এই বৎসর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপূর্ণ; সিরিয়ার বাণিজ্যের মৌসুম উপস্থিত হইয়াছে; বহু লোকই বিবি খাদীজার নিকট হইতে পুঁজি লইয়া সিরিয়ায় ব্যবসা করিতে যাইবে; তুমিও যদি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত; তোমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের দরুন অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচাকে উত্তর দিলেন, হযরত খাদীজা নিজেই আমার নিকট এই ব্যাপারে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তাই আমি স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা করি। আবু তালেব বলিলেন, ভয় হয় যে, অন্য সকলকে দেওয়া হইয়া গেলে হয়ত তোমাকে দেওয়ার মত কিছু থাকিবে না।

অতপর হযরতের উল্লিখিত ধারণাই বাস্তবায়িত হইল। খাদীজা স্বয়ং হযরতের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আপনার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং চরিত্র মহিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে; আমি আপনাকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুঁজি এবং অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়া ব্যবসায় নিয়োগ করিতে চাই। হযরত (সঃ) চাচাকে এই সংবাদ অবগত করিলেন। চাচা বলিলেন, এই অর্থনৈতিক সুযোগ আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন।

অতপর হযরত (সঃ) সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিলেন। বিবি খাদীজার বিশিষ্ট ক্রীতদাস মায়সারাও হযরতের সঙ্গে গেল। হযরত (সঃ) প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র বোসরায় পৌঁছিলেন। বোসরা শহরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসিলেন। নিকটবর্তী স্থানেই "নাসতুরা" নামক বিশিষ্ট পাদ্রীর অবস্থান ছিল। তিনি হযরতকে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় দেখিয়া তৎক্ষণাত হযরতের সঙ্গী মায়সারাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, এই লোকটি পয়গম্বর হইবেন। অতপর পাদ্রী স্বয়ং হযরতের নিকট আসিয়া তাঁহার কদমবুসী করিলেন, হযরতের মোহ্‌রে নবুয়তের প্রতি লক্ষ্য করত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহর রসূল হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ঐ পাদ্রী মায়সারার নিকট এই আক্ষেপও প্রকাশ করিলেন যে, কতই না সৌভাগ্য হইবে, যদি আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল পাই।

ঐ বোসরা শহরেই আর একটি লোক– যাহার সঙ্গে হযরতের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই লোকটিও মায়সারাকে জ্ঞাত করিয়াছিল যে, ইনি পয়গম্বর হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে এবং পাদ্রিগণও তাহা অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন মায়সারা এই সফরের মধ্যে সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রৌদ্রের মধ্যে চলাকালে দুই জন ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিত।* এমনকি হযরত (সঃ) যখন এই সুদীর্ঘ সফর হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন দুপুর বেলা মক্কা নগরীতে পৌঁছিলেন। ঐ সময় বিবি খাদীজা স্বীয় বাসভবনের দ্বিতলের বারান্দা হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তখনও ঐ দুই ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া ছিলেন এবং বিবি খাদীজা তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন। যখন মায়সারা বিবি খাদীজার নিকট

উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহাকে উক্ত ঘটনা বলিলেন। মায়সারা তাঁহাকে বলিলেন, আমি ত আগাগোড়া সম্পূর্ণ সফরেই এই অবস্থা বিরাজমান দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন মায়সারা বোসরা শহরের পাদ্রীর এবং অপর লোকটির উপরোল্লিখিত ঘটনাও বিবি খাদীজার নিকট ব্যক্ত করিলেন।*

বিবি খাদীজার সহিত হযরতের শাদী মোবারক (পৃষ্ঠা– ৫৩৮)

কোরায়শ বংশেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে 'খাদীজা' অতি সুপ্রসিদ্ধ রমণী ছিলেন। তিনি সারা মক্কায় সতীত্বে ও পাক-পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই মহিয়সী মহিলা পবিত্র জীবন যাপনে অতুলনীয় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্তরের শুচিতা শুভ্রতায় এবং চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি এতই সুনাম অর্জন করিয়া ছিলেন যে, লোকেরা তাঁহাকে খাদীজা না

* প্রাক ইসলাম যুগেও ফেরেশতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস ছিল। এমনকি মোশরেক পৌত্তলিক মক্কাবাসীদেরও ঐ বিশ্বাস ছিল। তাহারাও ফেরেশতাকে দেবদূত পবিত্রাত্মা ধারণা করিত। নবীজীর উপর ছায়াদানকারী বস্তু ত মেঘখণ্ডের আকৃতির ছিল, কিন্তু সৎ-সাধু ব্যক্তি নবীজীর উপর বোধমান প্রাণীর ন্যায় ছায়া দিয়া আসিতেছে দেখিয়া দর্শক মায়সারা উহাকে পবিত্রাত্মা ফেরেশতা গণ্য করিয়াছে এবং তাহা ব্যক্তও করিয়াছে।

*** সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য– যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ অস্বাভাবিক (অসম্ভব নয়) ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রস্তের ন্যায় বেসামারূপে নানা পচা-গলা, মল-ময়লার উদ্গিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। কতিপয় নমুনা পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে– যেমন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ১২ বৎসর বয়সে প্রথম বহির্দেশে গমন আলোচনায় এই বোসরা শহরেই পাদ্রীর ঘটনা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনায় এবং মায়সারার বর্ণনার ব্যাপারে ত খাঁ সাহেবের লেখনী পুরাদস্তুর কুৎসিত নর্দমার ন্যায় পূতি-গন্ধের উদগার করিয়াছে।

তিনি ক্ষেপিয়াছেন এই বলিয়া যে, "এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণ-গরিমার জন্য বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের অনুরাগিনী হন নাই। নাস্তুরার উক্তি, ইহুদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না।" (পৃষ্ঠা–২৩৯) মনে হয় মস্তিষ্কের শুষ্কতার দরুন খাঁ সাহেবের কর্ণকুহরে এরূপ একটা প্রলাপ ধ্বনিত হইয়াছে যে, একমাত্র এইসব ঘটনায়ই বিবি খাদীজা হযরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রলাপ ধ্বনি যে, তাঁহারই শুষ্ক মস্তিষ্কের জন্ম দেওয়া তাহা তিনি ঠাহর করিতে না পারিয়া পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণের প্রতি অযথা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাবলী আরবী-উর্দু ভাষায় লিখিত সমস্ত সীরাত সঙ্কলনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ সকলেই এইসব বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এইরূপ দাবী ত দূরের কথা ঘুর্ণক্ষরেও এইরূপ লেখেন নাই যে, হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরক্তির কারণ একমাত্র এই ঘটনাবলী ছিল।

আমাদের ন্যায় সকলেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রকৃতিগত মহিমা এবং উদীয়মান গুণ-গরিমাকে হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরাগিণী হওয়ার মূল কারণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য মায়সারা কর্তৃক আলোচ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা বিবি খাদীজাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। নবীজীর প্রকৃতিগত মহিমা ও গুণ-গরিমা খাদীজার হৃদয়ে রেখা না কাটিলে হযরত খাদীজাও আকরম খাঁ মরহুমের ন্যায় মায়সারার বর্ণনাগুলিকে বাহুল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

বিবি খাদীজা সারা মক্কায় বড় বড় লোকদের শত শত বিবাহ প্রস্তাব ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণে যে অগাধ ধন-দৌলতসহ এইরূপে লুটাইয়া পড়িলেন– ইহা নিশ্চয় এক বিরাট বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার পিছনে নিশ্চয় অন্য অস্বাভাবিক ঘটনাবলীও শক্তি যোগাইয়াছে।

ডাকিয়া 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত। (যোরকানী, ১)

প্রথমে একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি সেই স্বামীর ঔরসে দুই পুত্র জন্ম দান করেন। সেই প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য আর একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাহার ঔরসেও এক কন্যা জন্মদান করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু ঘটে; অতপর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতার দরুন অনেকেই তাঁহার পরিণয় লাভের অভিলাষী ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যদিও তখন নবী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি চরিত্রগুণের প্রসিদ্ধি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আকর্ষণেই খাদীজা (রাঃ) নিজে প্রস্তাব দিয়া হযরত (সঃ)-কে টাকা প্রদানে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদুপরি হযরতের প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিবি খাদীজার স্বচক্ষে অবলোকিত অলৌকিক ঘটনাদৃষ্টে তিনি আরও অভিভূত ছিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহারই গোলাম মায়সারার সাক্ষ্য ও বিবৃতি বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

খাদীজা (রাঃ) দীপ্ত সূর্যের প্রভাতী আলোর ইঙ্গিতে হযরতের ভবিষ্যত অনুধাবন করিতে পারিলেন। এতদ্ব্যতীত খাদীজা (রাঃ)-এর এক দূর সম্পর্কীয় মুরুব্বী চাচা ছিলেন "ওয়ারাকা ইবনে নওফল"। তিনি খাঁটি খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ও আসমানী কিতাব তওরাত ইঞ্জীলের পারদর্শী ছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; নাসতুরা পাদ্রীর উক্তি এবং মায়সারার দেখা ও শুনা ঘটনাবলী এবং নিজের দেখা ঘটনা সবই বর্ণনা করিলেন। সকল বিবরণ শ্রবণান্তে ওয়ারাকা বলিলেন, হে খাদীজা! যদি এইসব ঘটিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) এই যুগের নবী হইবেন; আমি আসমানী কিতাবের আলোকে এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছি; তাঁহার আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী, আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১-৮৩)

বিবি খাদীজার বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধ্বে। একে একে দুই বিবাহের পর তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবেলায় তাঁহার অন্তর-তলে এক নূতন স্বপ্ন উঁকি দিল, এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল। যে ভাবের প্রতি তিনি দীর্ঘ দিন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অনুরক্ত ছিলেন, ভুলেও এতদিন অন্তর তৎ প্রতি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই- সেই স্বপ্ন সেই সাধ আজ তাঁহার অন্তরকে নূতন করিয়া দোলা দিল- কেন? নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণ-গরিমা এবং তাঁহার অসাধারণ দীপ্ত ভবিষ্যতের কিরণমালায় সৃষ্ট আকর্ষণের দরুনই খাদীজা (রাঃ) এই অবেলায় তাঁহার জীবনতরী এক ভিন্ন স্রোতে ভাসাইতে উদ্যতই নহেন শুধু, বরং উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন।

এই নূতন প্রেরণা খাদীজা (রাঃ)-কে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, তাঁহার অন্তরকে যেন টানিয়া বাহিরে লইয়া ছুটিল। তিনি নিজকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, উদিত ভাবকে নিজ অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণতলে আশ্রয় লাভের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া পড়িলেন। এই ব্যতিব্যস্ততা ব্যাকুলতা তাঁহার চরম বুদ্ধিমত্তার এবং পরম সৌভাগ্যের পরিচায়কই ছিল- যাহা লাভে তিনি চির ধন্যও হইতে পারিয়াছিলেন।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) সহিত বিবি খাদীজার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল; নবীজীর পঞ্চম উর্ধ্বতন পিতার মধ্যে বিবি খাদীজার বংশ মিলিত। অতএব তাঁহার আবেগ প্রকাশে তিনি কিছুটা সাহস বোধ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার এক বিশেষ সহচরী, 'নাফিসা'কে নিয়োগ করিলেন নবীজীর মনোভাব আঁচ করার জন্য।* প্রতিকূলতার আশঙ্কা না দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বুক ভরিয়া উঠিল। এইবার তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বিবাহের সুস্পষ্ট প্রস্তাব পাঠাইতে সাহস করিলেন।

* বিশ্বনবীর জীবনী লেখক একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নাফিসার ভূমিকাকে নাটকের ললিত ভাষায় নাটকীয় রসিকতার ভাব-ভঙ্গিতে যে সাজ গোজ দিয়াছেন আমরা উহা নবীজীর জীবনী আলোচনার কোন ইতিহাসে পাই নাই। ঐরূপ না লেখাই বাঞ্ছনীয়; লালিত্য ও রসিকতার মাধুর্য সুন্দর বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর জীবনী বর্ণনায় অতিশয় সতর্কতা আবশ্যক।

খাদীজা (রাঃ) শুধু প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারিণীই ছিলেন না; ধন অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশী। তিনি পরিণত বয়স্কা বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শান্ত শ্রী, স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আত্ম-সৌন্দর্যের গুণাবলী যাহা ছিল তাহা ত অন্ধকার যুগের সমাজ চোখেও লুক্কায়িত ছিল না; যদ্দরুন স্বতঃস্ফূর্তরূপে সমাজ তাঁহাকে 'তাহেরা' পবিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার সেই গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য মাধুরী কি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চোখে ধরা পড়ে নাই? নিশ্চয় ধরা পড়িয়া থাকিবে। কারণ নবীজী (সঃ) নিজে পবিত্র; তিনি পবিত্রতার মূল্য না দিয়া পারেন কি?

قدر گل بلبل بداند یا بداند شاه پری

قدر گوهر شاه بداند یا بداند جوهری

ফুলের সৌরভ ভালবাসে বুলবুলি আর রাজপরী

মণি-মুক্তার কদর করে রাজ-রাজড়া আর জওহরী

আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন- اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ

"পবিত্র পুরুষদের জন্য পবিত্রা নারীগণ, পবিত্রা নারীদের জন্য পবিত্র পুরুষগণ (ইহাই স্বভাব, প্রকৃতি)।" (পারা-১৮ রুকু-৯) অতএব স্বভাব প্রকৃতির ধর্ম মতেই নবীজী (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আবেগের প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিধাতার নির্ধারণেও নবী মোস্তফা (সঃ)-এর জন্য খাদীজা তাহেরার ন্যায় একজন পবিত্রা, পারদর্শী, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণ শান্ত স্বভাব শান্তবুদ্ধিসম্পন্না জীবন সঙ্গীনীর প্রয়োজন ছিল; যিনি তাঁহার ঘরে -বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করিবেন। নবীজী (সঃ)-এর সম্মুখ জীবনে নানা প্রয়োজন দেখা দিবে; বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সমাধান প্রদানের জন্য আবশ্যক বিরাট প্রতিভার। সে প্রতিভা খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে কি পরিমাণের ছিল তাহা নবীজীর সহিত তাঁহার দাম্পত্য জীবনের পরম ও চরম সাফল্যই প্রমাণ করিবে। افتاب امد دليل افتاب "সূর্য নিজেই নিজের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ।"

কুদরতের খেলা- দেশে ও সমাজে সর্বত্র নবীজীর সদগুণরাজি এমনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে, সারা মক্কায় 'আল-আমীন' (সৎ-সাধু বিশ্বস্ত) নাম হযরতের জন্য অন্য সব নামকে ঢাকিয়া ফেলে। অপর দিকে খাদীজা (রাঃ)ও তাঁহার অপরিসীম মহত্ত্বের প্রভাবে 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী) নামেই পরিচিতা হইয়া পড়েন। এই দুইটি নামের পরিবর্তন-রহস্য বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব ব্যাপাররূপে স্বর্গের মঙ্গলধারা প্রবাহের ইঙ্গিত বহন করিতেছিল। কুদরত যেন নিজ হস্তে জগত জননী সতী-সাধ্বী তাহেরা (রাঃ)-কে বিশ্বনবী আল-আমীনের জন্য সহধর্মিনীর যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছের ঘটনায় জিব্রাঈল ফেরেশতার প্রথম সাক্ষাত এবং সর্বপ্রথম ওহীর অবতরণ চাপে নবীজী (সঃ) হেরা গুহা হইতে কাতর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ সময় খাদীজা (রাঃ) সান্ত্বনা ও বুঝ প্রবোধ দানে তাঁহার কাতরতা লাঘবে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চির বিদ্যমান থাকিবে। খাদীজা (রাঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভার সুফল নবীজী (সঃ) খাদীজার সহিত দাম্পত্য জীবনে সর্বদাই উপভোগ করিয়াছেন। এই সুখ, এই শান্তি, এই মাধুরী খাদীজা (রাঃ)-এর সান্নিধ্যে নবীজী (সঃ) সর্বদাই লাভ করিতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে খাদীজা (রাঃ) নবীজীর (সঃ) সুখ-শান্তি যোগাইয়া চির ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার এই বিরাট সাফল্যের দ্বারাই নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের পরম তৃপ্তি এবং চরম সন্তুষ্টির মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রীতির সহিত খাদীজা (রাঃ) নিজকে নবীজীর চরণে বিলাইয়া দিয়া তাহার মনকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, খাদীজা (রাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায়

নিয়াও নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তর হইতে বিদায় নিতে পারেন নাই। খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে হযরত (সঃ) গভীর মর্ম বেদনায় শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি বিবি খাদীজার মৃত্যু বৎসরকে নবী (সঃ) 'আমুল হোয্ন'– শোকের বৎসর আখ্যা দিয়াছেন। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরও সকল স্ত্রীর উর্ধ্বে ছিল তাঁহার আসন; তাঁহার আসন কেহই দখল করিতে পারেন নাই।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরবর্তী জীবনের তরুণ বয়স্কা সর্বাধিক ভালবাসার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে ইঙ্গিতবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৬৭। হাদীছ ঃ বিবি খাদীজার প্রতি আমি যেরূপ গায়রত (নিজকে তাঁহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করিতাম' নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন স্ত্রীর প্রতি সেইরূপ অনুভব করিতাম না, অথচ আমি (খাদীজার সময় পাই নাই–) তাঁহাকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী (সঃ) তাঁহার স্মরণ, তাঁহার আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন (আমার মন তাঁহার প্রতি ঐরূপ ছিল)।

নবী (সঃ) অনেক সময় বকরী জবাই করিতেন এবং সম্পূর্ণ গোশ্ত বণ্টন করিয়া খাদীজার বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি কটাক্ষ করিয়া বলিতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ভিন্ন আর কোন মহিলা জন্মে নাই! উত্তরে নবী (সঃ) আবার খাদীজার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিতেন– খাদীজা এরূপ ছিল, ঐরূপ ছিল; তাঁহার হইতে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) নবীজীর সেবা কিরূপ অন্তরে করিতেন তাহা অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তাই আল্লাহ তাআলা খাদীজা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ)-এর সেবা এক বিশেষ ভূমিকায় এমন এক সৌভাগ্য উপহার দিয়াছেন যাহা পয়গম্বর ভিন্ন কাহারও লাভ হয় নাই।

১৬৬৮। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (নবী (সঃ) হইতে শ্রবণপূর্বক ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হঠাৎ জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখনই বিবি খাদীজা আপনার খাদ্য সামগ্রী পাত্রে করিয়া নিয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়া পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম বলিবেন এবং আমারও সালাম বলিবেন; আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ (শান্তি-নিকেতন) মতি-মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শব্দও হইবে না, কোন বিষন্নতাও থাকিবে না। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) গুণ-গরিমা ও মহত্ত্বের এত উচ্চ শিখার জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার নিকটবর্তী হওয়াও জগতের অন্য কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৬৬৯। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন মারইয়াম। আর আসমান-যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খাদীজা। (৫৩৮– পৃষ্ঠা)

মহীয়সী মহিলা বিবি খাদীজার মহত্ত্ব নবীজীর চরণ ছায়ায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূলের অধিকারিণী তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই ছিলেন এবং উহার উন্নতির যোগ্য পাত্রীও তিনি ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁহার ন্যায় পবিত্রা মহীয়সীকে ধুলার ধরণীতে বেহেশতী সওগাত বলিলে অত্যুক্তি হইত না। মক্কার গণ্যমান্য বড় বড় সর্দার কত জনেরই না আকাঙ্ক্ষা ছিল বিবি খাদীজার প্রতি, অথচ তিনি আবার বিবাহ হইতে এতই নির্লিপ্ত ছিলেন যে, সেইরূপ প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্ত সৌভাগ্য তাঁহাকে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাঁহার মহত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি নবীজী (সঃ)-কে আহ্বান করিল। যেরূপ–

"জওহরী জওহর চিনে, ভোমরায় চিনে মধু
ভোমরা কি বসে কভু রং দেখিয়া শুধু?"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নত হইবে সংসারী জীবন। ইসলাম স্বভাব ধর্ম। সুষ্ঠু ও পবিত্র স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহাও আছে। নর-মাদী মিশ্রিত জীবন যাপনই জীবনের স্বভাব। "মানুষ" আরবী "মানুস" শব্দের ভাষান্তর, যাহার ধাতুগত অর্থ প্রেম ও ভালবাসার মিলন শান্তির প্রত্যাশী। অতএব নর-নারীর মিলিত জীবনই মানুষের স্বভাব। এই মিলনের পবিত্রতা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে। তাই নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّى ـ

অর্থ ঃ "বিবাহ আমার আদর্শ, যেব্যক্তি আমার আদর্শ হইতে বিরাগী হইবে সে আমার জামাতভুক্ত পরিগণিত নহে।"

নবী (সঃ) আরও বলিয়াছেন لاسياحة فى الاسلام "সন্যাস জীবন ইসলামের আদর্শ ও নীতি নহে।" বিশ্ববাসীর জন্য যে আদর্শ ভাবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন নবীজী (সঃ), আজ তিনি স্বীয় জীবনে তাহা বাস্তবায়নে অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ)-এর সহিত খাদীজা (রাঃ)-এর সহচরী নাফিসার আলোচনা আশাব্যঞ্জক পাওয়া মাত্র খাদীজা (রাঃ) স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব দিয়া নবীজীর (সঃ) খেদমতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাইয়া নবীজী (সঃ) স্বীয় মুরুব্বী চাচাগণের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইয়া গেল। নির্ধারিত তারিখে হযরতের চাচা আবু তালেব এবং হামযাসহ আরও কোরায়শ বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বর যাত্রায় যোগদান করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর পক্ষে তাঁহার পিতা; কাহারও মতে পিতা তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁহার অভিভাবক চাচা আমর ইবনে আসাদ এবং দূর সম্পর্কীয় চাচা বিশিষ্ট সৎ সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল বিবাহ সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ মজলিসে খাজা আবু তালেব হযরতের পক্ষে অভিভাষণ বা খোতবা পাঠে বলিলেন, প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে ইব্রাহীমের কুলে ইসমাঈলের বংশে জন্ম দিয়াছেন। আমাদের তাঁহার ঘরের সেবক এবং জনসাধারণের নেতা– নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন। অতপর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদ সমগ্র কোরায়শ গোত্রে জ্ঞানে গুণে অতুলনীয়; সকলেই মুহাম্মদের নিকট হার মানিতে বাধ্য; যদিও ধন তাহার কম। কিন্তু ধন ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং হাত-বদলের সাময়িক বস্তু মাত্র। মুহাম্মদের আত্মীয়-স্বজনের গৌরব সর্ববিদিত। মুহাম্মদ খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজার বিবাহ পয়গাম বরণ করিয়াছেন। নগদ ও দেন-মহরানার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।" (যোরকানী, ১–২০২) "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

বিবি খাদীজার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় বিশিষ্ট আলেম সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসার পর কোরায়শ গোত্রের গৌরব এবং আবু তালেব বংশের (বনী হাশেম) প্রাধান্যের স্বীকৃতি উল্লেখপূর্বক বলিলেন, আমরা আপনাদের সহিত মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি এবং তাহাতে আনন্দ বোধ করি। সকলে সাক্ষী থাকুন– খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজাকে আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদের বিবাহে প্রদান করিলাম। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, রাযিয়াল্লাহু আনহা।

মহরানা চারি শত দেরহাম পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। নবীজী (সঃ)-এর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর ছিল; আরও বিভিন্ন মতামত আছে। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ; এ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইহা নবীজী (সঃ)-এর প্রথম বিবাহ এবং খাদীজা (রাঃ)-এর তৃতীয় বিবাহ ছিল। বিবি খাদীজার প্রথম বিবাহ আবু হালাহ নামক ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল, সেই পক্ষে তাঁহার দুই ছেলে ছিল– "হিন্দ" এবং "হালাহ", তাঁহারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণপূর্বক ছাহাবী হইয়াছিলেন। একবার "হালাহ" নবী

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিলেন, নবী (সঃ) তখন নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "হালাহকে" বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী আবু হালার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল "আতীক" নামক ব্যক্তির সহিত। এই পক্ষে তাঁহার এক কন্যা ছিল, নাম "হিন্দ", তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (যোরকানী– ১-২০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং খাদীজা (রাঃ)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। কি অপূর্ব শাদী ছিল ইহা! যাঁহার গুণ-গরিমার তুলনা নাই, সুখ্যাতি সুনাম এবং গৌরব যশের অভাব নাই– ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন কুমারী তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের স্বভাব ধর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই তরুণ যুবক বিবাহ করিলেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা, বহু দিনের যৌবনহারা দুই বারের বিধবা এক মহিলাকে। কারণ, দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, কামরিপু চরিতার্থের জন্য তদ্রূপ কোন লালসা বা মোহবশেও এই বিবাহ ছিল না। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ হইল– মোস্তফা (সঃ) ও তাহেরার (রাঃ) সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিচ্ছন্ন মধুর জীবন যাপন। এক দিনের জন্য নহে, এক মাস বা এক বৎসরের জন্য নহে– দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকার এই জীবনসঙ্গিনীর সহিত হাসিমুখে অনাবিল অন্তরের প্রীতি ভালবাসায় কাল কাটাইয়াছেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) অন্য বিবাহের চিন্তাও কোন দিন করেন নাই। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ তথা যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত গোটা জীবনই নবীজী (সঃ) অতিবাহিত করিয়াছেন এই স্ত্রীর সহিত।* এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের তরেও বিরাগী হন নাই, বিরক্ত হন নাই। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি কোন অভাব অপূরণের অভিযোগ আনেন নাই, অনুযোগ করেন নাই কোন দিন। এই পরম তৃপ্তি ও চরম সন্তুষ্টির দাম্পত্য জীবন কি সম্ভব হইত যদি স্বার্থসিদ্ধির মানসে বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এই বিবাহ হইত? গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধনে সমভাবে আবদ্ধরূপে কাটিয়াছে উভয়ের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। বরং খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে দৈহিক বিচ্ছিন্নতার পরেও ছিন্ন হয় নাই নবীজী (সঃ)-এর হৃদয়ের বন্ধন। খাদীজার স্মরণে নবীজী (সঃ) কত সৌহার্দ্য দেখাইয়াছেন খাদীজার বান্ধবীদের প্রতি! খাদীজার ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণে।

২৬৭০। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যুর বহু দিনের পরের ঘটনা–) একদা বিবি খাদীজার ভগ্নী হালাহ বিনতে

খোয়াওয়ায়লেদ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ! ইহা যেন হালাহর কণ্ঠস্বর হয় (যাহা আমি ভাবিয়াছি)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই অবস্থাদৃষ্টে আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হইল! আমি বলিলাম, আপনি এক দাঁত-পড়া বুড়ীকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? কোন্ যমানায় মরিয়া গিয়াছে! অথচ তাহার অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলন; যাহাতে আমি এ বলিতে বাধ্য হইলাম যে খোদা আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আর কোন সময় আমি বিবি খাদীজার সমালোচনা করিব না। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

বিবি খাদীজার কত উচ্চ আসন ছিল নবীজীর অন্তরে, কিরূপ আবিষ্ট ছিল নবীজীর অন্তর তাঁহার প্রতি! ক্ষণস্থায়ী লালসায় হৃদয়ের এরূপ চির বন্ধন কি সৃষ্টি হইতে পারে?

---

* পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর নবীজী (সঃ) অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বহু বিবাহকে মূলধন বানাইয়া নবীজীর গ্লানি ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা গরম করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর পিশাচমনা লোকদের লক্ষ্য করা উচিত, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যৌবন-জীবনের প্রতি। বহু বিবাহের যে তাৎপর্য তাহারা দেখাইতে চায় তাহা কি মানুষের বার্ধক্যকালে দেখা দেয় না যৌবনকালে। নবীজী (সঃ) সারা যৌবনকাল যেরূপ স্ত্রীর দাম্পত্যে যেভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে কোন সুধী সুষ্ঠু মস্তিষ্কের মানুষ বিভ্রান্ত হইতে পারে কি?

নবীজীর (সঃ) বিবাহ ছিল এই উদ্দেশে যে, তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সাধনে মিশিয়া যাইবেন মাটির মানুষের সহিত। স্বাভাবিক অধিবাসী হইবেন মাটির জগতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহার সুন্নতী জীবনের আদর্শ ও নীতি। পাত্রী নির্বাচনে মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও স্থূল লাবণ্যের পিয়াসী হয়, কিন্তু নবীজী (সঃ) ছিলেন গুণের সৌন্দর্য ও দেহের অন্তরালে লুক্কায়িত সুষমা পিয়াসী। এই সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিলেন খাদীজা তাহেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তাই তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্বাচন লাভে চির ধন্য চির সৌভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

খাদীজা (রাঃ) তাহার সমুদয় ধন-সম্পদ হযরতের অধিকারে দিয়া দিলেন। হযরতের জন্য এই সচ্ছলতার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান ও রহমত ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই হযরতকে সম্বোধন করিয়াছেন, وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى "আপনি ছিলেন নিঃস্ব রিক্তহস্ত, অতপর আপনার প্রভুই আপনাকে সচ্ছল ধনাঢ্য করিয়াছেন।"

শাদী মোবারকের পর

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর ভাবী সুন্নত হইবে মানবীয় আবেষ্টনে থাকিয়াও সর্বদা আল্লাহর পানে নিয়োজিত থাকা। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন গড়িলেও ভোগ-বিলাসে পড়িবে না, কোন আকর্ষণেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। এই মনোবল ও আত্মসংযম লইয়া সব রকম বেড়াজাল এবং কোলাহলে থাকিয়াও মাওলার সঙ্গে মুক্ত নিরালা থাকিবে। কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ত্যাগী হইয়া সন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাসনা-কামনার উপাদানের মধ্যে সংযম-সাধনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়া জীবন প্রান্তর অতিক্রম করিবেন– ইহাই হইবে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত।

এখন হইতে সেই সুন্নতের জীবন আরম্ভ হইল নবীজী মোস্তফার (সঃ)। বিবাহের পর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত পনরটি বৎসর নবীজী মোস্তফার জীবন আদর্শমূলকই ছিল। নবীজী (সঃ) পূর্ব হইতেই ব্যবসায় অভিজ্ঞ ছিলেন; বিবি খাদীজারই ধন নিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন; এখন ত বিবি খাদীজার সমুদয় ধন-দৌলত তাঁহার চরণে নিবেদিত। একদিন বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বিরাট ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করিতেন; এখন ত তিনি গৃহবধূ– নবীজী মোস্তফাই তাঁহার হর্তাকর্তা।

ব্যবসা বা তেজারত নবীজীর একটি বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজী (সঃ)-এর হাদীছ–

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء .

অর্থ ঃ "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামত দিবসে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সহিত একত্রে থাকিবে।" (মেশকাত শরীফ) ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নানা দেশের নানা বৈচিত্রের মধ্যে তাহার গমনাগমন ঘটে, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার গুণ লাভ হয়– নানা মনের নানা স্বভাবের মানুষের সহিত সর্বদা পালা পড়িতে থাকে। এতদ্ভিন্ন মানুষের কঠিন পরীক্ষাও হইতে হয়; একদিকে ধনের সমাগম, অপর দিকে সততা, সাধুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন; অতএব বাণিজ্যের ভিতর দিয়া মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি লাভ হইতে থাকে।

সুযোগপ্রাপ্তিতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) বাণিজ্যানুরাগী ছিলেন; বিভিন্ন দেশে তাঁহার বাণিজ্য সফরের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। বোসরা ও সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্যের বর্ণনা ত আছেই, এতদ্ভিন্ন ইয়ামান বাহরাইনের বাণিজ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (সীরাতুন নবী দ্রষ্টব্য)

এই পনর বৎসরে নবীজী মোস্তফার পাঁচ সন্তান জন্মলাভ করেন– এক পুত্র "কাসেম", যিনি সকলের বড় ছিলেন, বাল্য অবস্থায়ই ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। চার কন্যা– (১) যয়নব (রাঃ), বিবি খাদীজার ভাগিনা আবুল আছের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমান হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন; বিবি

যয়নব তাঁহার বিবাহেই ছিলেন (২) রোকাইয়া (রাঃ) (৩) উম্মে-কুলসুম (রাঃ); প্রথমে তাঁহাদের বিবাহ হযরতের চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সহিত হইয়াছিল। নবীজী (সঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলে আবু লাহাব দম্পতি তাঁহার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করে; ফলে তাহার এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফে সূরা "লাহাব" অবতীর্ণ হইল; সেই আক্রোশে আবু লাহাবের পুত্রদ্বয় ক্ষুব্ধ হইয়া নবীজী (সঃ)-এর কন্যাদেরকে ত্যাগ করে।

রোকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত হয়; হিজরী দ্বিতীয় সনে বিবি রোকাইয়ার ইন্তেকাল হইলে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ তাঁহারই সহিত হয়। হযরতের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হইলেন খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত তাঁহার শাদী হইয়াছিল।

নবীজীর কন্যাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যার কোন সন্তান জীবিত ছিল না। যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শুধু এক কন্যা– উমামা (রাঃ) জীবিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান ছিল না। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন; ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ ধারা এই দুইজন হইতেই চলিয়া আসিতেছে; প্রকৃত সৈয়দগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিবি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এক কন্যাও ছিলেন– উম্মে কুলসুম; তাঁহার বংশ চলে নাই।

নবী হওয়ার পর বিবি খাদীজার পক্ষে হযরতের আরও তিন বা দুই পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন; আবদুল্লাহ, তৈয়্যব ও তাহের। কাহারও মতে একই ছেলে– নাম আবদুল্লাহ, ডাক নাম তৈয়্যব ও তাহের ছিল; তিনি বা তাঁহারা কেহই বাঁচিয়া থাকেন নাই। হিজরতের পরেও হযরতের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল– নাম "ইব্রাহীম" তিনি মারিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভজাত ছিলেন; শৈশবেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হযরতের পোষ্যপুত্র

নবী হওয়ার পরবর্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হযরতের এই বর্ণিত আছে–

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি প্রথম দৃষ্টি তাঁহার রাজসিক প্রভাব দর্শকের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিত; আর অকপটতার সহিত তাঁহার সাথে মেলামেশা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিত।"

প্রথম বাক্যের মর্ম ত আল্লাহর দান নবুয়তের প্রভাব ছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হযরতের স্বাভাবিক চরিত্র মাধুর্যের ফসল এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রথম জীবন হইতেই ছিল। হযরতের দাস ও পোষ্যপুত্র যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস এই সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণীয়।

হারেসা পুত্র যায়েদ হযরতের দাস ছিল, তাহার দাসত্বের কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী। আট বৎসর বয়সের শিশু যায়েদকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতা মামা বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের উপর লুটেরাদের আক্রমণ হয়, শিশু যায়েদকে তাহার মায়ের কোল হইতে লুটেরা দল ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাহারা যায়েদকে দাস বানাইয়া লয়। এভাবেই যায়েদ পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সিরিয়ার কোন বাজারে বিক্রীত হয়।

বিবি খাদীজার ভ্রাতুষ্পত্র হাকীম ইবনে হেযাম সিরিয়া হইতে কতিপয় দাস ক্রয় করিয়া আনেন; তন্মধ্যে যায়েদও ছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) ঐ দাসগুলি দেখিতে গেলে হাকীম বলিলেন, ফুফু আম্মা! আপনি একটি দাস পছন্দ করিয়া নিন। খাদীজা (রাঃ) যায়েদকে নিয়া আসিলেন; হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার নিকট যায়েদকে হেবা চাহিলেন। খাদীজা (রাঃ) হযরতের হস্তে যায়েদকে হেবা করিয়া দিলেন। যায়েদ হযরতের গৃহে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে যায়েদের পিতা-মাতা পুত্রকে হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়া গিয়াছে। তাহার বিচ্ছেদে পিতা-মাতার মনোবেদনার সীমা থাকে নাই। এই বিচ্ছেদ যাতনায় যায়েদের পিতা একটি হৃদয়বিদারক কবিতা রচনা করে। কবিতাটি এতই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, অচিরেই তাহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; এমনকি ঐ কবিতা মক্কায় পৌঁছিল এবং যায়েদের গোচরেও আসিল। এইভাবে যায়েদের পিতা-মাতার নিকট যায়েদের খোঁজ পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইল। খোঁজ পাইয়া যায়েদের পিতা যায়েদের চাচাকে সঙ্গে নিয়া মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিল। তাঁহারা হযরতের বংশের সুখ্যাতি, বদান্যতা ও দেশজোড়া প্রশংসার উল্লেখপূর্বক মুক্তিপণের বিনিময়ে যায়েদের মুক্তি প্রার্থনা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যায়েদ যদি আপনাদের সহিত চলিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে কোন প্রকার পণ ব্যতিরেকেই আমি তাহাকে মুক্তি দানে আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব। আর যদি সে আমার নিকটই থাকিতে চায় তবে যেব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে রাজি না হইবে আমিও তাহাকে কোন বিনিময়েই ছাড়িতে রাজি হইব না। তাহারা বলিল, আপনি ত ন্যায়ের ঊর্ধ্বে উদারতার প্রস্তাব করিলেন। হযরত (সঃ) যায়েদকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যায়েদ ঠিকরূপেই পরিচয় বলিল– তিনি আমার পিতা হারেসা, আর তিনি আমার চাচা কা'ব।

হযরত (সঃ) এইবার বলিলেন, যায়েদ! আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম– তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার পিতা ও চাচার সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার নিকটও থাকিতে পার। যায়েদ তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনরূপে বলিয়া দিল, আমি আপনার নিকটই থাকিব। তখন যায়েদের পিতা তাহাকে বলিল, হে যায়েদ! তুমি তোমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশ-খেশ ছাড়িয়া গোলামী অবলম্বন করিতেছ? যায়েদ উত্তর করিল, আমি এই মহানের যে ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী দেখিয়াছি, আমি তাঁহাকে কখনও ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) যায়েদের হাত ধরিয়া কোরায়শদের সমাবেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যায়েদের মুক্তি নহে শুধু, বরং তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিও– এই যায়েদ আমার পুত্র । এই ঘোষণায় যায়েদের পিতা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল– আরবের শ্রেষ্ঠ কোরায়শ বংশের বনী হাশেম গোত্রের আবদুল মোত্তালেবের গৃহে আল-আমীনের পুত্র হইয়াছে যায়েদ– এই সৌভাগ্যের আনন্দ যায়েদের পিতাকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা একমাত্র তাহার অন্তরই অনুভবই করিতে পারিয়াছে। তখন হইতে "মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ" পরিচয়ই প্রবল হইয়া গেল। (ইবনে হেশাম, ১–২৪৭)। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

এই যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে একমাত্র যায়েদেরই এই সৌভাগ্য যে, তাঁহার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার পূর্বে শুধুমাত্র খাদীজা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা.আনহুরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম জীবনে হযরতের গৃহভৃত্য ছিলেন। মানুষের সর্বময় অবস্থার অভিজ্ঞতা গৃহসঙ্গিনীর পরে গৃহভৃত্যের সর্বাধিক বেশী থাকে। মানুষ কৃত্রিমরূপে বাহিরে সব কিছুই সাজিতে পারে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তাহার কোন কৃত্রিমতা টিকিয়া থাকিতে পারে না। গৃহসঙ্গিনী বা গৃহভৃত্যের নিকট তাহার কৃত্রিমতা অবশ্যই ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব হযরতের প্রতি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সর্বাগ্রে ঈমান গ্রহণ যেরূপ হযরতের সত্য ও খাঁটি নবী হওয়ার বিশেষ প্রমাণ ছিল, তদ্রূপ গৃহভৃত্য যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান গ্রহণও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই হইল নবীজীর সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিত বর্ণনা। আলোচ্য ১৫ বৎসর সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আর একটি বিশেষ তৎপরতা এবং মহতী প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

শেরেক বর্জন ও তওহীদ অন্বেষণে নবীজী (সঃ)

তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত শেরেকী কাজ হইতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেরূপ ঘৃণা হওয়া এবং পবিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল, নবী হওয়ার পূর্ব হইতেই তিনি বাস্তবে তাহাই ছিলেন। ছোট বড় কোন শেরেকী কাজের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও হইত না। অধিকন্তু তিনি মক্কা এলাকায় একত্ববাদী লোকদের অন্বেষণে থাকিতেন। ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে শেরেকীর যে অভিশাপ প্রচলিত আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরম্ভের সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই তৎপরতায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা এলাকার প্রসিদ্ধ একত্ববাদী যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথাবার্তাও বলেন। এই যায়েদ ইবনে আমর মূর্তিপূজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করিতেন। সত্য ধর্মের তালাশে তিনি সিরিয়া এবং ইরাক পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের চাচাত ভাই ছিলেন; ওমরের পিতা তাঁহাকে তাঁহার মতবাদের জন্য ভীষণ উৎপীড়ন করিত; তাঁহাকে মক্কায় আসিতে দিত না। কিন্তু তিনি একত্ববাদে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তিনি নবীজীর পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া কাঁদিয়াছে এবং বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি সত্য ধর্ম না পাইয়া একত্ববাদের উপরই মৃত্যুবরণ করিতেছি। তাঁহার ছেলে সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ইসলামের যমানা পাইয়াছিলেন এবং মুসলমান হইয়া অতি বড় মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আশারা মোবাশ্‌শারাহ অর্থৎ দশ জন ছাহাবী আনুষ্ঠানিকরূপে রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন; সায়ীদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন।

হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– একদা আমি নবীজীর (সঃ) সহিত মক্কার পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিলাম; তথায় যায়েদ ইবনে আমরের সহিত নবীজীর (সঃ) সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়ে অতি সৌজন্যের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনার জাতি যেসব অপকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে আপনি তাহা অবগত আছেন; তাহার প্রতিকারের কোন চিন্তা করেন কি? যায়েদ ইবনে আমর বলিলেন, সত্য ধর্মের খোঁজে আমি সিরিয়া ও ইরাক গিয়াছিলাম। তথায় তওরাত-ইঞ্জীলেরএকজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞাত হইলাম, সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অচিরেই মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার আবির্ভাবের শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়াই আমি মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষায় আছি।

অদৃষ্টের পরিহাস– নবীজীর (সঃ) সঙ্গেই নবীজী সম্পর্কে তাঁহার কথাবার্তা হইল, কিন্তু নবীজীর আবির্ভাবকাল তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে খাঁটি তওহীদই মুক্তির ভিত্তি ছিল; অতএব তিনি মুক্তির পাত্র। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হইবেন। (আসাহহুস সিয়ার–৫৮)

এই যায়েদ ইবনে আমরের আলোচনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৬৭১। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কার নিকটস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রান্তে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়শ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে দওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (তাহাতে গোশ্‌ত ছিল)। নবী (সঃ) তাহা খাইতে অস্বীকার করত যায়েদ ইবনে আমরের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়শগণ; তোমারা দেব-দেবীর নামে পশু জবাই করিয়া থাক– আমি তাহা খাই না। আল্লাহর নামে জবাইকৃত হইলে খাইয়া

থাকি। যায়েদ ইবনে আমর সর্বদা কোরায়শদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া-বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার যমীন হইতে উৎপাদনের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ; আর সেই ভেড়া-বকরী তোমরা জবাই কর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় অন্যায় বলিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে আমর সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সত্য ধর্মের খোঁজ করিতে। তথায় এক ইহুদী আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম অবলম্বন করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর গজব লইব না। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, আমার জানা মতে আপনি একমাত্র হানীফ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হানীফ ধর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্ম– তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাসরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এতটুকুর খোঁজ আছে,) তিনি একত্ববাদী ছিলেন– এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা তিনি করিতেন না।

অতপর যায়েদ এক খৃস্টান আলেমের সহিত সাক্ষাত করিলেন; তাঁহার নিকটও ঐরূপ বলিলেন যেরূপ ইহুদী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন। খৃস্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর অভিশাপ কখনও নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর অভিশাপের কিঞ্চিতও লইব না, আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধান দিবেন কি? তিনিও হানীফ ধর্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মমত সম্পর্কে বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম– একত্ববাদের খোঁজ পাইলেন তখন সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আবু বকর (রাঃ) তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি যায়েদ ইবনে আমরকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, হে কোরায়শগণ! আমি ভিন্ন তোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর নহে (অর্থাৎ তোমরা হযরত ইব্রাহীমের ধর্মের মিথ্যা দাবীদার। কারণ, তোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একত্ববাদী)।

যায়েদ ইবনে আমর অন্ধার যুগের সব অপকর্ম হইতে পবিত্র ছিলেন। মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ঐরূপে হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে চাও!) আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, ব্যয়ভার আমি বহন করিব; তাহাকে হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি ঐ হতভাগীকে নিজ আশ্রয়ে নিয়া যাইতেন এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন, ইচ্ছা করিলে এখন তোমার কন্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া চলিব। (পৃষ্ঠা–৫৪০)

মক্কাতে এই শ্রেণীর আরও কয়েকজন একত্ববাদী ছিলেন, যথা–ওযারাকা ইবনে নওফল, যাঁহার উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, ওসমান ইবনুল হোয়াইরেস এবং কোস্ ইবনে সায়দা।

শেষোক্ত ব্যক্তি ত সুপ্রসিদ্ধও ছিলেন; তাঁহার নামে আদর্শমূলক অনেক ভাষণও বর্ণিত আছে। এমনকি এরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে যে, আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ "ওকাজ" মেলায় তিনি এক ভাষণে নবীজী মোস্তফা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের আলোচনাও করিয়াছিলেন যে– একজন পয়গম্বরের আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধন্য হইবে তাহারা যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তিনি তাহাদের জন্য সত্যের দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের জন্য ধ্বংস। এই ভাষণে নবীজী (সঃ)ও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এতদ্ভিন্ন এই সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীর সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমনকি তাহাদের বড় বড় বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসীতে নবীজী (সঃ)-কে পাইলে তাহারা সকলেই আনন্দ বোধ করিত, সালিসীতে তাঁহার ভূমিকাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বরণ করা হইত।

সামাজিক সালিসীতে হযরত (সঃ)

আমরা যেই সময়ের আলোচনা করিতেছি তখনকার একটি ঘটনা– ঐ সময় কোরায়শরা কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ আরম্ভ করিল। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বহির্দেশে মানুষের বক্ষ পরিমাণ উপরে "হাজরে আসওয়াদ" নামীয় অতি মর্তবা ও মর্যাদাশীল বিশেষ পাথর খণ্ড স্থাপিত আছে। (বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় টুকরা আকারে আছে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড হজ্জের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লেখক যাঁহারা তাহা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত; এই ক্ষেত্রে তাঁহারা এমন বিবরণ লিখিয়াছেন যাহা বাস্তব অবস্থার হিসাবে হাস্যাস্পদ।)

কা'বা গৃহের উক্ত পুনঃ নির্মাণে উহার দেওয়াল যখন এই পরিমাণ উঁচু হইল, যেখানে উক্ত বিশেষ পাথর মোবারক বসাইতে হইবে, তখন বিভিন্ন গোত্রীয় সর্দারদের পরস্পর বিরোধ বাধিয়া গেল– কে এই মহা বরকতের পাথর খণ্ড যথাস্থানে স্থাপিত করার সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। প্রত্যেকে সেই সৌভাগ্য লাভের প্রয়াসী, এমনকি এই কোন্দলে একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম।

হযরতের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি একজন যুবক; কিন্তু সমগ্র দেশে তাঁহার গুণ মাধুর্যের এতই প্রভাব ছিল যে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় সর্দারদের কাহারও উপর ঐকমত্য স্থাপন সম্ভব হইতেছিল না, সে ক্ষেত্রে হযরত (সঃ) সালিস নিয়োজিত হওয়ার উপর সকল গোত্র, সকল দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সহিত ঐকমত্য স্থাপন করিয়া নিল। হযরত (সঃ)ও এমন মীমাংসা করিলেন যাহা বিরোধমান সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিল। বিধাতাই যেন নবীজী (সঃ)-কে এই বিরোধে সালিসী করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মক্কাবাসীদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তাহাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা রক্তপাতে লিপ্ত হইও না; আগামী প্রভাতে সর্বাগ্রে যেব্যক্তি হরম শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিবে তাহাকে সালিস নিযুক্ত করিয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। পর দিন অনেকেই এই সৌভাগ্যের প্রয়াসী হইয়া হরম শরীফে আসিল, কিন্তু দেখা দেল, সর্বাগ্রে একমাত্র মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। নবী মোস্তফা (সঃ)-কে পাইয়া সকলে উল্লাস-ধ্বনি দিয় উঠিল– هذا محمد الامين رضينا هذا محمدا "এই যে মুহাম্মদ আল-আমীন; আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম (সীরাতে-মোস্তফা, ১–৬৮)

হযরত (সঃ) মীমাংসা করিলেন যে, সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি পাথর খণ্ড একটি বড় চাদরের উপর রাখিবেন; প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার সেই চাদর বহনে অংশগ্রহণ করিবে। এইরূপে সেই বরকতের পাথর বহনে সকলেই সমভাবে অংশীদার হইবে। অতপর হযরত (সঃ) সকলের প্রতিনিধিরূপে চাদর হইতে পাথরখানা যথাস্থানে স্থাপন করিবেন। হযরতের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ মীমাংসায় সকলে মুগ্ধ-সন্তুষ্ট হইল এবং সেই অনুযায়ী কার্য সমাধা করা হইল।